কৃষ্টি

Krishti

জাকির হুসেন দিল্লি কলেজ (সান্ধ্য)
দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা সাহিত্য পত্রিকা
বিকশিত ভারত@২০৪৭ বিশেষ সংখ্যা

ISSN 2348-8468
পঞ্চান্ন বর্ষ (১৪৩০/২০২৪)

কৃষ্টির সম্পাদকমণ্ডলী

বাংলা বিভাগের ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকগণ

A peer-reviewed ISSN Bengali Journal

ISSN 2348-8468

জাকির হুসেন দিল্লি কলেজ (সান্ধ্য)

বাংলা পত্রিকা

বিকশিত ভারত@২০৪৭ বিশেষ সংখ্যা

কৃষ্টি

পঞ্চান্ন বর্ষ

২০২৪ ১৪৩০

পৃষ্ঠপোষকঃ অধ্যাপক ডঃ মাসরুর আহমেদ বেগ (অধ্যক্ষ)

উপদেষ্টামণ্ডলীঃ

অধ্যাপক সনৎ কুমার নস্কর, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক রেজাউল করিম, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক উৎপল মণ্ডল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক অমিতাভ চক্রবর্তী, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক রাজ্যেশ্বর সিনহা, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক সাইফুল্লাহ, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়

ডঃ সেলিম বক্স মণ্ডল, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সম্পাদক মণ্ডলীঃ

প্রধান সম্পাদকঃ ডঃ মুন্সী মহম্মদ ইউনুস

সহযোগী সম্পাদকঃ ডঃ আল মহসিনা মোজাম্মিল

সহকারী সম্পাদকঃ ডঃ মহঃ জামিলুর রহমান, ডঃ শ্রীতা মুখার্জি, ডঃ তিলক সরকার

ছাত্র সম্পাদকঃ সোহম খান, সঞ্জনা পাইক

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা – ডঃ মুন্সী মহম্মদ ইউনুস

বি.দ্র. - পত্রিকায় প্রকাশিত লেখার বা তার মৌলিকতার দায় একমাত্র লেখক বা লেখিকার। পৃষ্ঠপোষক বা সম্পাদকের এ বিষয়ে কোন দায় নেই।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়		1
বাংলা সাহিত্য গোষ্ঠীর(ইচ্ছে) সংবাদ		2
কলেজ অধ্যক্ষের বার্তা		3

প্রবন্ধ

আধুনিক বাংলা সাহিত্য পাঠের কিছু সূত্র	মুন্সী মহম্মদ ইউনুস	5
বাংলা প্রণয়কাব্যে নাটকীয়তা : প্রসঙ্গত ইউসুফ জোলেখা ও লায়লী মজনু	ডঃ মহঃ জামিলুর রহমান	11
হারানের নাতজামাই – একটি সমীক্ষা	ডঃ শ্রীতা মুখার্জী	16
রক্তকরবী ও রবীন্দ্রনাথ নাট্যকার যখন মঞ্চনির্দেশক :	ডাঃ সেখ মোফাজ্জল হোসেন	21
মধ্যযুগের জঙ্গনামাধর্মী সাহিত্য ও সাবিরিদ খানের রসুল বিজয়	আসাদুজজামান	25
রূপকথা ও ছোটোদের স্বপ্ন : একটি তাত্ত্বিক আলোচনা	অন্তরা দত্ত	36
মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে ইতিহাস আশ্রিত কাব্য : সমাজ ও সংস্কৃতির বৈচিত্র্য	জয়ন্ত বিশ্বাস	41
বিখ্যাত কয়েকজন বাগ্মী ও তাঁদের উল্লেখযোগ্য ভাষণ	তামান্না	57
রথের রশি: সমাজ পরিবর্তনের এক প্রতিবাদী চিত্র	ডঃ তিলক সরকার	74

কবিতার পাতা

বিষণ্ণতা	শুভ্রা রায়	77

বিকশিত ভারত@২০৪৭ সম্পর্কিত বিশেষ লেখা

বিকশিত ভারত – একটি প্রস্তাবনা	ডঃ শ্রীতা মুখার্জী	79
গণতন্ত্র এবং ভারতবর্ষ: এক যুগ	অনিকেত ঘোরাই	81

২০৪৭ অব্দি কেমন ভারত দেখতে চাই	সঞ্জনা পাইক	87
২০৪৭ অব্দি কেমন ভারত দেখতে চাই	সোহম খান	88

সোসাইটি সংবাদ

ইংরেজি লিটারারি সোসাইটি রিপোর্ট	90
ফিল্ম অ্যান্ড ফটোগ্রাফি সোসাইটি রিপোর্ট	92
আর্টস অ্যান্ড কালচার সোসাইটি রিপোর্ট	94
বজম ই আদাব সোসাইটির রিপোর্ট	99
পঞ্চতত্ত্ব: ইকো-ক্লাব এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজ সোসাইটি রিপোর্ট	102
সরমায়া - কমার্স সোসাইটি রিপোর্ট	104
সংস্কৃত ডিপার্টমেন্টাল সোসাইটি রিপোর্ট	109
গণিত সোসাইটি সিফরের বার্ষিক প্রতিবেদন	110
এনএসএস ইউনিটের বার্ষিক প্রতিবেদন	111

সম্পাদকীয়

তারপর কেটে গেল ঢের সময়। যমুনার জল গ্রীষ্মে কালো, শীতে সাদা – ফেনা মাখা। মরকের ইঁদুরের মত মাথা গুঁজে দুঃসময়কে অতিক্রান্ত করা মানুষ আজও চিরস্থায়ী সুদিনের স্বপ্নে বিভোর। শেষ বসন্তে দিল্লির আনাচে কানাচে বড় বৃক্ষের শরীর জোড়া লাল হলুদ ফুলের সাজি। এদিকে সময় মহতী, সময় দ্রুত পরিবর্তনশীল। শিক্ষা ক্ষেত্রে সেমিস্টার, এফঅয়াইইউপি, লোফ পেরিয়ে আমরা এখন এন ই পি তে আসীন। হয়তো এই পথেই আলো জ্বেলে পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে। ২০৪৭ সালের মধ্যে আমাদের দেশ পূর্ণ বিকশিত হবে – এই লক্ষ্য আজ আমাদের সংকল্প। আমরা স্বপ্ন দেখি জাতি – ধর্ম – বর্ণ – লিঙ্গ – ভাষা নির্বিশেষে আমাদের একটিই পরিচয় – আমরা ভারতবাসী।

কলেজের কথায় বড়ই আনন্দের সঙ্গে জানাই, আমাদের বিভাগে তিনজন স্থায়ী শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছেন। ডঃ মহঃ জামিলুর রহমান (যিনি দীর্ঘ দিন কলেজে অ্যাড হক শিক্ষক হিসেবে কাজ করছিলেন), ডঃ তিলক সরকার এবং ডঃ শ্রীতা মুখার্জী। এছাড়াও অন্যান্য সমস্ত বিভাগের নতুন স্থায়ী শিক্ষকদেরও আমরা অভিনন্দন জানাই।

এ কথা সর্বজনবিদিত যে আমাদের মহাবিদ্যালয়য়ের মুল সুর হল – “Live by Love”. আমরা আশা করি এই ভালোবাসা সঞ্চারিত হোক আমাদের সবার মধ্যে। কল্যাণ ও প্রীতির বোধ ছড়িয়ে পড়ুক প্রত্যেকের হৃদয়ে।

কৃষ্টির এই সংখ্যা বিগত বছরগুলির মতো পাঠকের ভালোবাসা লাভ করুক। অলমতি।

মুন্সী মহম্মদ ইউনুস

বাংলা সাহিত্য গোষ্ঠীর(ইচ্ছে) সংবাদ

বাংলা বিভাগ, জাকির হুসেন দিল্লি কলেজ সান্ধ্য ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে একটি একদিনের কর্মশালার আয়োজন করে। এই কর্মশালার বিষয় ছিল ‘বাংলা বি এ প্রোগ্রাম সিলেবাসের বিশ্লেষণ’। জাকির হুসেন কলেজের সহযোগী অধ্যাপক ডঃ শর্মিষ্ঠা সেন এই কর্মশালাটি চেয়ার করেন। ডঃ অন্তরা চৌধুরী (দেশবন্ধু কলেজ), ডঃ শাশ্বতী গাঙ্গুলী(মিরান্ডা হাউস), ডঃ দীপক মাইতি(কিড়োরিমাল কলেজ) এই কর্মশালার আমন্ত্রিত বক্তা ছিলেন। এই কর্মশালায় বাংলা বি এ প্রোগ্রাম সিলেবাসের সমস্ত কোর্স সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। এই আলোচনায় বর্তমান সিলেবাসের কিছু ভুল ত্রুটি ধরা পড়ে। সেগুলো ভবিষ্যতে পরিবর্তনের প্রস্তাব করা হয়। এই কর্মশালার আহ্বায়ক ডঃ জামিলুর রহমানের ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধমে এই অনুষ্ঠান শেষ হয়।

বাংলা বিভাগ এ বছর অনলাইন সেমিনারেরও আয়োজন করে। সেটি ছিল ১১ মার্চ ২০২৪ তারিখে। এই সেমিনারের বিষয় ছিল ‘মাইকেল মধুসূদন দত্ত : ফিরে দেখা’। এই সেমিনারটি চেয়ার করেন বর্তমান কলা বিভাগের ডিন অধ্যাপক অমিতাভ চক্রবর্তী। এই সেমিনারের আমন্ত্রিত বক্তারা ছিলেন অধ্যাপক রফিক উল্লাহ খান, শক্তি সাধন মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক সোনালি মুখার্জি, অধ্যাপক নন্দিতা বসু। অনুষ্ঠানের সূচনায় অধ্যাপক মুন্সি মহম্মদ অনুষ্ঠানটির স্বাগত ভাষণ দেন। তারপর অধ্যাপক অমিতাভ চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানটি সফলভাবে সম্পন্ন হয়। অনুষ্ঠানের শেষে ডঃ জামিলুর রহমান ধন্যবাদজ্ঞাপন করেন।

কলেজ অধ্যক্ষের বার্তা

জাকির হোসেন দিল্লি কলেজে (সান্ধ্য), আমরা বছরের পর বছর একাডেমিক শ্রেষ্ঠত্ব এবং পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কার্যকলাপের উচ্চতা বাড়াতে চেষ্টা করি। বিশ্ববিদ্যালয় এবং দিল্লি শহরের শিক্ষাগত মানচিত্রে আমাদের প্রতিষ্ঠানকে তুলে ধরার জন্য আমাদের অবিরাম এবং নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে আমাদের সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। আমরা মনে করি যে আমাদের শিক্ষার্থীরা এই প্রতিষ্ঠানের অংশ হতে পেরে সত্যিই ভাগ্যবান। আমাদের শিক্ষার্থীদের জন্য একটি নিরাপদ শারীরিক, সামাজিক এবং শিক্ষাগত পরিবেশ তৈরি করার জন্য সর্বদাই আমাদের প্রচেষ্টা থাকে। আমরা তাদের মধ্যে সংগ্রামের মূল্যবোধ এবং কঠোর পরিশ্রম এবং উৎসর্গের মাধ্যমে সাফল্যকে পাওয়ার চেতনাকে জাগায়। আমার বিশ্বাস আমাদের শিক্ষার্থীরা কলেজের বাইরেও তাদের জীবনে এইভাবে অনুপ্রাণিত মূল্যবোধ বহন করবে এবং প্রতিষ্ঠানের সুনাম বয়ে আনবে।

জাতির জীবনের এই সংকটময় সন্ধিক্ষণে, আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টা আরও জরুরী এবং গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে কারণ আমরা এখন 2047 সালের মধ্যে ভারতকে একটি উন্নত দেশে পরিণত করার মতো স্বপ্ন দেখার মহান মিশনের অংশ, যেমনটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁর বিকশিত ভারতের দৃষ্টিভঙ্গিতে কল্পনা করেছেন। আমি বিশ্বাস করি আমাদের কলেজ এবং কলেজের সকল সদস্য এই স্বপ্নের সাফল্যে পূর্ণ অংশগ্রহণ করবে।

বিকশিত ভারত@২০৪৭ এর লক্ষ্য লাভের জন্য, আমরা আমাদের অবদান রাখতে সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত। এই উদ্দেশ্যে, আমি সমস্ত শিক্ষক এবং ছাত্রদের আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে নিজেকে এই লক্ষ্য নিয়োজিত করার জন্য আবেদন রাখছি। আমার আনন্দিত যে কলেজের সকল সদস্যরা এই মিশনের গুরুত্ব বুঝতে পেরেছেন এবং এটিকে তাদের শিক্ষাদান এবং পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কার্যকলাপে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এর মধ্যে শুধুমাত্র শিক্ষাদীক্ষার প্রতি নয়, শৃঙ্খলার সংস্কৃতি গড়ে তোলার দিকেও ইতিবাচক মনোভাব রয়েছে। এটি আমাদের শিক্ষার্থীদের আরও ভালো মানুষে পরিণত হতে সাহায্য করে।

বার্ষিক বাংলা ম্যাগাজিন, কৃষ্টির বিষয়বস্তু এই মিশনটি পূরণ করার জন্য আমাদের প্রচেষ্টার প্রতিফলন। যদিও এটি ছাত্র এবং শিক্ষাকর্মীদের সৃজনশীল এবং সমালোচনামূলক দক্ষতা প্রদর্শনের জন্য একটি জায়গা দেয়, তার সাথে এটি আমাদের সমস্ত পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কার্যকলাপের রেকর্ড রাখার জন্য একটি ফোরামও। এইভাবে, ম্যাগাজিনের প্রতিটি সংখ্যা হল আমাদের সমস্ত কৃতিত্বের একটি সত্য সংরক্ষণাগার। পত্রিকাটির আরেকটি সংস্করণ বের করার প্রচেষ্টার জন্য আমি সম্পাদকীয় দলকে অভিনন্দন জানাই। আমাদের সকল শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীদের কঠোর পরিশ্রম এর প্রকাশনায় প্রতিফলিত হয়।

আমি ইতিবাচক যে ক্রমবর্ধমান এবং ক্রমাগত টিমওয়ার্কের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি ভবিষ্যতে আরও বড় সাফল্য অর্জন করবে।

আসন্ন অধিবেশনের জন্য শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ সহ,

অধ্যাপক(ডঃ) মাসরুর আহমেদ বেগ

অধ্যক্ষ, জাকির হুসেন দিল্লি কলেজ (সান্ধ্য)

প্রবন্ধ

আধুনিক বাংলা সাহিত্য পাঠের কিছু সূত্র

অধ্যাপক মুন্সী মহম্মদ ইউনুস

অধ্যাপক, জাকির হুসেন দিল্লি কলেজ (সান্ধ্য)

আলোচ্য বিষয় নিয়ে কোন কথা বলার আগে, নিজের সঙ্গে নিজের একটা দ্বিরালাপ গড়ে তোলা জরুরি। যার সূচনা আমাদের ছাত্র অবস্থা থেকেই। কলেজ জীবন থেকেই যখন 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য' – এই শব্দবন্ধের কথা শুনে থাকি, তখন তার উপলব্ধিকে ঘিরে একধরণের দ্বিধা আমাদের মনে তৈরি হয়। কারণ উনিশ শতকের সাহিত্যের সঙ্গে এই আধুনিক শব্দটি ওতপ্রোত ভাবে আমাদের চেতনার সঙ্গে জুড়ে আছে। সেক্ষেত্রে মাইকেল থেকে রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ থেকে বিহারীলালের নাম উঠে আসে। বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, গিরিশ ঘোষ প্রমুখেরা তো আছেনই।

তাহলে প্রশ্ন উঠে আসে,উনিশ শতকে বাংলা ভাষায় রচিত সকল সাহিত্যই যদি আধুনিক হয়, তাহলে কেবল কবিতার ক্ষেত্রেই জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে, বিশ শতকে জীবনানন্দ কিংবা শক্তি চট্টোপাধ্যায়, বিনয় মজুমদার থেকে শঙ্খ ঘোষ – প্রত্যেককেই কি আমরা আধুনিক বলব? ততোটাই আধুনিক যতটা উনিশ শতকের কবিরা ছিলেন? না কি উভয়ের আধুনিকতার মধ্যে কোন মাত্রাভেদ আছে? কিছু কি রকমফের আছে পাঠকের উপলব্ধিতে?

এ প্রসঙ্গে আরও একটি সম্পর্কিত প্রশ্ন করা যেতে পারে, আমরা যখন প্রাক উপনিবেশের সাহিত্য পড়ি, তখন কেন একটি প্রশ্নের মুখোমুখি আমাদের প্রায়শই পড়তে হয় – "মধ্য যুগের মঙ্গল কাব্যের আধুনিকতা বিচার কর" বা "মধ্য যুগের বাংলা রোমান্টিক সাহিত্যে আধুনিক জীবন বোধের পরিচয় দাও"। তাহলে উনিশ শতক তো বহু পরের বরং চোদ্দ থেকে আঠারো শতকের বাংলা সাহিত্যে কেন আধুনিকতার লক্ষণ খোঁজার চেষ্টা করা হয়? এহো বাহ্য। আঠারো ও উনিশ শতকের মধ্যবর্তী সময়ের কবি ভারতচন্দ্রের প্রসঙ্গ যখনই আলোচনায় আসে, আবশ্যিকভাবে তাঁর রচনায় আধুনিকতাকে কেন খোঁজা হয়?

এই প্রশ্নক্রম একভাবে আমাদের মধ্যে এক দ্বিধার জন্ম দেয়। মূলিগত ভাবে প্রশ্ন উঠে আসে, আমরা তাহলে আধুনিকতা বলতে ঠিক কি বুঝব? আসলে এই আলোচনায় আমরা আধুনিকতাকে ঘিরে এক দ্বিধা – দ্বন্দ্ব থেকে সম্ভাবনা তথা ধারণার এক প্রস্থান কেন্দ্র নির্মাণের চেষ্টা করব।

আবার প্রশ্ন হল, আধুনিকতাকে ঘিরে আমাদের উপলব্ধিগত সমস্যাটা কোথায়? সেই সমস্যাকে কি ভাবে পড়া যেতে পারে? আর তা থেকে উত্তরণের উপায়টা কি? কাজেই আমাদের প্রাথমিক আলোচনা এই ধারণাগত দিক থেকেই উন্মোচন করাটা জরুরি।

এখানে মূল প্রেক্ষিতটা হল, এই আলোচনার একদিকে যদি থাকে ইতিহাস ও সময়কাল তাহলে অন্যদিকে রয়েছে সাহিত্য। আর এই দুয়ের মধ্যে যে বিষয়টা তরল দাঢ্যের মতো কাজ করে যাচ্ছে তা হল, ‘গ্রহন’ বা যাকে ইংরেজিতে বলে reception. বিষয়টি বরং একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝার চেষ্টা করতে পারি। ধরা যাক, আমরা একটি উপন্যাস পড়ছি। এখন যে হাজার মানুষ উপন্যাসটি পড়ছেন, তাদের সবার পাঠই কি একই রকম হবে? কেননা, সময়ভেদে, লিঙ্গভেদে, অর্থনীতি ভেদে, সামাজিক অবস্থানভেদে – প্রতিটি ব্যক্তিগত পাঠকের পাঠ উপলব্ধি ভিন্ন হবে। মোদ্দাভাবে, এই বিষয়টিকেই আমরা তত্ত্বগত ভাবে reception বলছি। এ প্রসঙ্গে আরো একটি বিষয় এসে হাজির হয়। তা হল, আাধুনিকতা বিষয়টি আমরা কেমন করে বুঝব?

এখানে একটি কথা আমরা পরিষ্কার করে বলতে চাই, বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার ধারণার সবচেয়ে বড় বাধা হল যুগ বিভাগ। বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতাকে বুঝতে তথা ধারণাগত প্রস্থানকে গড়ে তোলার কাজে সবচেয়ে বড় অন্তরায়, এই যুগ বিভাজনের পদ্ধতি।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সময়কালের হিসেবে সবচেয়ে বেশি প্রচলিত যুগ বিভাগটি হল – প্রাচীন যুগ, মধ্য যুগ এবং আধুনিক যুগ। সমস্যাটি ঠিক এই জায়গাতেই তৈরি হয়। কারণ, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকারেদের মতে উনিশ শতক থেকেই বাংলায় আধুনিকতার সূচনা। তাহলে ব্যাপারটি কি এরকম ছিল, যে ১৮৯৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর রাত ১১:৫৯ মিনিটের পর এমন কিছু একটা ঘটে গেল যে বাংলা সাহিত্য মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে প্রবেশ করল? আর আমরা সবাই আধুনিক হয়ে উঠলাম। অর্থাৎ এর আগে আমাদের মধ্যে কোনরকম আধুনিকতার বোধ ছিল না? বা উনিশ শতকের পর কি কোন অন্য আধুনিকতা জন্ম নেয় নি? এক্ষেত্রে বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার এই উপলব্ধিগত সমস্যাটিই সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দেখা দেয়।

এ প্রসঙ্গে আমাদের তিনটি সূত্রের কথা মাথায় রাখতে হবে। সেগুলি হল –

১। আধুনিক মানেই কিন্তু আধুনিকতাবাদ নয়। তাত্ত্বিক ভাবে যাকে আমরা Modernization বলি, আর চলতি ভাবে যাকে Modern Literature বলি, এই দুটি বিষয় কিন্তু এক নয়। দুটির মধ্যে একটা সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে।

২। আমরা যখন উনিশ শতকের সমাজ ও সাহিত্য নিয়ে কথা বলি তখন এ প্রসঙ্গে উপনিবেশবাদ বা colonialization এর প্রসঙ্গ নিয়ে আসি। কিন্তু মুশকিল হল এক্ষেত্রে আমরা উপনিবেশবাদকেই আধুনিকতা বলে

চিহ্নিত করে ফেলি। কিন্তু এই দুটি তো এক নয়। এটাই যদি সত্য হত, তাহলে উপনিবেশিকতা সম্পর্কে ধারণা এবং তার সচেতন বিরোধিতা উত্তর উপনিবেশিক মননে ধারাবাহিক ভাবে দেখা যেত। উত্তর উপনিবেশিকতা তো উপনিবেশিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। কারণ, উত্তর উপনিবেশিকতা উপনিবেশবাদের সমালোচনা বা বিরোধিতার মাধ্যমেই রূপ পায়। আর বিষয়টা যদি এমনটাই হতো তাহলে একটা 'নীল দর্পণ', 'সধবার একাদশী', কিংবা 'একটা বুড়ো সালিখের ঘাড়ে রোঁ' বা 'একেই কি বলে সভ্যতা' – এমন কয়েকটি নাটক ছাড়া সেভাবে আর তেমন প্রতিবাদী সাহিত্য আমরা সে সময় দেখতে পেলাম না কেন? মানে পরাধীন ভারতবর্ষে যে প্রতিষ্ঠিত শাসন পরিকাঠামো – তাকে প্রশ্ন করতে পারে এমন সাহিত্য কোথায়? এটা ঘটনা যে এই সময় পর্বে 'মেবারের পতন' বা 'পলাশি বিজয়ে'র মত কাব্য লেখা হয় নি বা 'রাজপুত জীবন সন্ধ্যা' বা 'আনন্দমঠে'র মতো উপন্যাস লেখা হয় নি তা নয়। কিন্তু যেটা বলতে চাইছি, সেটা হোল, এটা কোনভাবেই কেন্দ্রিয় প্রবনতা ছিল না। অন্যদিকে এটাও প্রশ্নের দায়ারার মধ্যে চলে আসে যে এই সমস্ত রচনায় বিরোধিতা বা প্রতিরোধ থাকলেও তা কতোটা উপনিবেশ বিরোধি আর কতোটা উপনিবেশিক জ্ঞান কাঠামোর আবর্তে লেখা। ফলে ভারতীয় তথা বাংলা সাহিত্যের প্রেক্ষিতে আমরা যখন আধুনিকতার কথা বলি, সেটা কিন্তু উপনিবেশবাদের সঙ্গে জুড়ে সব সময় দেখা যায় না।

৩। আমাদের আলোচনায় এক্ষেত্রে যে তৃতীয় সূত্রের কথা আমরা উল্লেখ করতে চাই তা হল, বাংলা সাহিত্যের আলোচনায় যে উনিশ শতকের তথাকথিত রেনেসাঁ, তার সঙ্গেও কিন্তু আধুনিকতাকে পুরোপুরি জুড়ে দেখা যায় না। কারণ, ভারতীয় তথা বাংলার যে রেনেসাঁ তার মধ্যে যে পরস্পর বিরোধিতা ছিল, তা কোনভাবেই আমাদের এক সুনিশ্চিত বা ধারাবাহিক পরিনতির দিকে নিয়ে যায় নি।

তাহলে আবারও সেই প্রাথমিক প্রশ্নেই আমাদের ঘুরে ফিরে আসতে হয়। তা হল, আমরা আধুনিকতা বলতে কি বুঝব? বিষয়টি বুঝতে গেলে আমাদের পূর্ব কথিত তিনটি সূত্রের কথা মাথায় রেখেই অগ্রসর হতে হবে। আর তার আগে একটু স্মরণ করে নিতে হবে ইউরোপীয় রেনেসাঁর চরিত্র লক্ষণগুলি। এটা বোঝার জন্য সে সময়ের একটি উপন্যাসের সাহায্য নিতে পারি। সেটা হল, ভলতিয়ারের লেখা কাঁদিদ উপন্যাসটি। উক্ত উপন্যাসে আমরা দেখতে পাই, কাঁদিদ স্থানীয় জমিদার বাড়িতে কাজ করত। কিন্তু জমিদার কন্যাকে প্রেম নিবেদন করার শাস্তি হিসেবে জমিদার তার পাছায় বেশ কয়েকটি লাথি কষিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দেয়। কাঁদিদ অনিশ্চয়তার পথে নিজেকে ভাসিয়ে দেয়। এদিকে বিপ্লবের ফলে জমিদারের জমিদারি চলে যায়। সে খুন হয়। এমনকি জমিদার কন্যাও গুম হয়ে যায়। তারও কিছু পরে কাঁদিদ নিজের গ্রামে ফেরে। চাষের জমিতে যায়। কাঁদিদকে দেখে তার গুরু প্লঁতাস বলেন – ঈশ্বরের পৃথিবী বড়ই সুন্দর। আর কাঁদিদ উত্তরে বলে – কিন্তু আমাদের সবার কর্তব্য হল নিজের জমি চাষ করা।

এই উদাহরণটা আমরা কেন উপস্থাপন করলাম? এর কারণ হল, এইসব বিষয় নিয়ে আলোচনায় আমরা অনেক শব্দের জালে জড়িয়ে যাই। কেননা , আধুনিকতার আলোচনায় যে সব পাশ্চাত্য শব্দবন্ধ আমরা উল্লেখ করি, সেই সব coinage গুলো সবই Eurocentric coinage। এগুলো আমাদের দেশিয় ধারণা নয়। বড়জোর বোঝার সুবিধার জন্য আমরা সেগুলি ব্যবহার তথা আত্মীকরণ করার চেষ্টা করি। এজন্যই যখন আমরা একটা পাশ্চাত্য তাত্ত্বিক কাঠামো ভারতীয় সমাজ-সাহিত্যের উপর আরোপ করতে চাই – তখনই আমাদের উপলব্ধিগত সমস্যার সৃষ্টি হয়। কেননা পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব তো কোন ভাবে আমাদের ভারতীয় সমাজ সাহিত্যের পাঠের উপযোগী মাধ্যম হিসেবে গড়ে ওঠেনি। দুটির প্রেক্ষিত ভিন্ন, আবেদন ভিন্ন। যেটুকু সম্পর্ক তা প্রায়োগিক। অর্থাৎ দেশ – কাল – সময় – প্রেক্ষিত – সমস্ত কিছুকে মাথায় রেখে tool হিসেবে পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্বকে দেশিয় সাহিত্য বিচারে ব্যবহার করা। এই সামগ্রিক বিষয়টি মাথায় রেখে যদি আধুনিকতার চরিত্র লক্ষণগুলি খোঁজা হয়। তাহলে সেগুলি নিম্নলিখিতভাবে উপস্থাপন করা যেতে পারে। -

১। আধুনিকতার ধারণার মধ্যে সব সময় একরকম Eurocentric ব্যাপার থাকবে। অর্থাৎ ইউরোপে শিল্প সাহিত্য যেমনটা নির্মিত হয়েছে, তেমনটা গড়ে তোলার এক দেশিয় প্রচেষ্টা।

২। ইউরোপীয় আধুনিকতার একটি বড় চরিত্র লক্ষণ হল Rise of Science. সবকিছুকেই, এমন কি সাহিত্যকেও বিজ্ঞানের সাপেক্ষে দেখার ও বিচার করার একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

৩। Search of experiment বা তুল্যমূল্যের বিচারে যে কোন ঘটনা বা বিষয়কে দেখার দৃষ্টি ইউরোপীয় আধুনিকতার ফলাফল।

৪। Individualism বা ব্যক্তি সাতন্ত্র্যবাদ ইউরোপীয় আধুনিক সাহিত্যের এক কেন্দ্রিয় লক্ষণ। যদিও উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যেও এই চরিত্র লক্ষণ অনেক আখ্যান বা কাব্যে দেখতে পাওয়া যায়।

৫। Industrialization বা বাণিজ্যায়ন ইউরোপীয় আধুনিকতার পিলসূজ হিসেবে কাজ করে গিয়েছিল।

সব মিলিয়ে যে বিষয়টা আমরা ইউরোপীয় আধুনিকতায় দেখতে পেয়েছি, সেটা হল, একটা traditional rural agricultural society থেকে সমাজ ও তার সৃজনের চাহিদা যখন একটা secular urban industrial society র দিকে পৌঁছায় – সেই বিষয়টিকেই আমরা ইউরোপীয় অর্থে আধুনিকতা বলি। এক্ষেত্রে ইউরোপীয় যে আধুনিকতা তার সঙ্গে আরো কয়েকটি বিষয় আমাদের আবশ্যিকভাবে স্মরণ রাখতে হবে। কেননা ইউরোপে সেই পর্বের সঙ্গে Reformation, Enlightenment এবং Tread revolution অঙ্গাঙ্গি ভাবে জুড়ে ছিল। আর এই তিনের ফলশ্রুতি ছিল the rise of bourgeois. আর এই জায়গা থেকে যখন আমরা আমাদের নিজেদের

প্রেক্ষিত অর্থাৎ বাংলায় আসব তখন দেখতে পাব এক বিশাল দ্বিধা। ভাবনার বিষয় হল, ভারতীয় যে চিরায়ত সমাজ – অর্থনীতির পরিকাঠামো তা ছিল মূলত সামন্তবাদী । আর উনিশ শতকে বিশ্বজনীন ভাবে যে পুঁজিবাদের বিকাশ তা সম্ভব হয়েছিল ইউরোপীয় মারকেন্টাইল অর্থনীতির হাত ধরে। কিন্তু বাংলায় উনিশ শতকে দেশিয় পুঁজিবাদের সার্বিক বিকাশ কোন ভাবেই ঘটে নি , যা হয়েছিল তা বিক্ষিপ্ত ভাবে পেটি বুর্জোয়ার উত্থান। এমনকি স্বাধীনতাপূর্ববর্তী সময়কালে ভারতে জামসেদজী টাটা প্রমুখের হাত ধরে যে দেশিয় পুঁজির উত্থান তার রূপও মুষ্টিমেয় বৃহৎ পুঁজির বিকাশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এমন কি বর্তমান ভারতে পুঁজির বিকাশকে যদি বিচার করা হয় তাহলে তা আজও সংখ্যা গরিষ্ঠভাবে সীমাবদ্ধ বৃহৎ পুঁজিপতিদের হাতেই আবদ্ধ।

এটা তথ্য যে পুঁজির বিকাশের দুটি স্তর আছে। যার একটি যদি base structure reality হয় তবে অপরটি হল super structure reality । প্রথমটি দ্বিতীয়টিকে প্রভাবিত করবেই। প্রথম পর্যায়ের বাস্তবতা যদি অর্থনীতি হয় তাহলে দ্বিতীয় পর্যায়ে থাকে সাহিত্য, সংস্কৃতি, ধ্যান ধারণা ও সামাজিকতা। এবং পুঁজিবাদী সমাজের সবচেয়ে বড় লক্ষণ হল ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ অর্থাৎ যাকে আমরা বলি মত প্রকাশের স্বাধীনতা। এখন এই বিষয়টি যখন একটা সামন্তবাদী পরিকাঠামোর ও অর্থনীতির উপর আরোপ করা হয় তখন একটা সংঘাতের ক্ষেত্র তৈরি হয়। আর এখান থেকেই সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে ইউরোপে পুঁজির বিকাশ থেকে ধনতন্ত্রের উত্থান যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সংঘটিত হয়েছিল, ভারতে তথা বাংলায় কিন্তু তা সেভাবে হয় নি। ফলে ইউরোপীয় আধুনিকতার সঙ্গে চরিত্র লক্ষণ মিলিয়ে যদি কেউ ভারতীয় আধুনিকতাকে অনুসন্ধান করতে চান, তাহলে তা সম্ভব হবে না। আর সাহিত্য ও সংস্কৃতিও তার অনুসারী। আমাদের মনে হয়, আধুনিকতাকে ঘিরে আমাদের কেন্দ্রিয় ভ্রান্তিটা ঠিক এই জায়গায়।

আলোচনায় এ পর্যন্ত আসার পর এটা অন্তত পরিষ্কার হল যে আধুনিকতাকে ঘিরে মূল সমস্যাটা কি। কিন্তু এবার যে প্রসঙ্গের আলোচনাটা জরুরি তা হল, এর সমাধান। অর্থাৎ পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য আধুনিকতার মধ্যে আমাদের নিজেদের আধুনিকতাকে আমরা কি ভাবে পড়ব?

এই সমস্যার সমাধানের জন্য আমাদের পৌঁছে যেতে হবে রোঁলা বার্তের কাছে। বার্ত একটা ন্যারেটিভের গঠনের সঙ্গে একটা টিপয়ের গঠন সাযুজ্যের কথা উল্লেখ করেছিলেন। বার্তের মতে একটা ন্যারেটিভের গঠনে সেই তিনটি পা হল যথাক্রমে – Form, Content এবং Representation. সমস্যা হচ্ছে, আমরা যখন সাহিত্য আলোচনা করি, আমরা যখন সাহিত্যের আধুনিকতা নিয়ে কথা বলি, তখন কেবল মাত্র তার কথাবস্তুর উপর গুরুত্ব দিই, অর্থাৎ ন্যারেটিভের কাহিনির উপর নির্ভর করে আমরা বিচার করি যে সেটা প্রাচীন না মধ্যযুগীয় না কি আধুনিক বা উত্তর আধুনিক। আসলে আমাদের দেশিয় সমালোচকদের মধ্যে একটা যথেচ্ছ অভিধা ব্যবহারের প্রবনতা আছে

– আর এখানেই গণ্ডগোলটা তৈরি হয়। কারণ যাকে আমরা ইংরেজিতে post Morden বলি আর বাংলায় উত্তর আধুনিক বলি, প্রতিশব্দের এই গ্রহণকে ঘিরেই বাংলায় একটা বিতর্ক আছে। পশ্চিমবঙ্গের একটা সমালোচক গোষ্ঠী তাঁদের মত করে দাবি করেন post Morden এবং উত্তর আধুনিক এক নয়। কাজেই এই সমাজ – সাহিত্যিক অভিধাগুলি ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমাদের খুব সচেতন থাকতে হবে।

এই জায়গা থেকে আমাদের যেটা উপলব্ধি, তা হল, গঠনগত দিক থেকে আমাদের দেশিয় সাহিত্যের একটা ঐতিহ্য ছিল। সেই ঐতিহ্যটা কোথায়? না আমাদের মাথায় রাখতে হবে, যদি বাংলা সাহিত্যের প্রেক্ষিতে বলা হয়, তাহলে আমাদের ঐতিহ্য মঙ্গল কাব্য, শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন, নাথ সাহিত্য, রোমান্টিক সাহিত্য, পাঁচালি, পালা – এইগুলোই আমাদের চিরায়ত ঐতিহ্য। উনিশ শতকে যখন উপন্যাস বা আখ্যান কাব্যের নির্মাণ হল, সেটা হয়েছিল ইউরোপীয় অদরাকে অনুসরণ করে। আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছিলাম যে ইউরোপের আধুনিকতার এক প্রধান চরিত্র লক্ষণ ছিল Eurocentrism, মানে তারা সমস্ত কিছুকে ইউরোপের প্রেক্ষিতে দেখতে চায়। ভারতের ঔপনিবেশিক সাহিত্য প্রচেষ্টার মধ্যে এই বিষয়টিই কেন্দ্রিয় ভাবে দেখা গেল। কিন্তু এই মূল ধারার বাইরেও কিছু সাহিত্যিক – শিল্পী ছিলেন, যারা এই প্রবণতা থেকে সরে আমাদের দেশিয় আধুনিকতাকে খোঁজার চেষ্টা করেছিলেন। তাকে মূল ধারায় প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছিলেন। আর সেখানেই সতীনাথ ভাদুড়ির 'ঢোঁড়াই চরিত মানসে'র কথা চলে আসবে। চলে আসবে দেবেশ রায়ের 'তিস্তা পারের বৃতান্ত'। এই যে ধারা সেখানেই দেশিয় অনুসঙ্গের ও প্রবনতার ভিত্তিতে এক চিরায়ত আধুনিকতাকে আবিষ্কারের চেষ্টা আছে। একেই আমরা Formatical Modernism বলে থাকি। যে আধুনিকতা আমাদের নিজস্ব – স্বাভাবিক ধারাবাহিকতায় গঠিত।

আসলে ইউরোপের প্রেক্ষিতে আর একটি কথা আমরা মনে করতে চাই, ইউরোপ যখন একের পর এক আধুনিক সাহিত্যের নির্মাণ করছে, তার প্রতিবেশি হয়েও লাতিন আমেরিকা তার দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে না। বরং তারা নিজেদের দেশিয় ঐতিহ্য নিয়েই নিজেদের আধুনিক সাহিত্যকে গড়ে তুলছে। মার্ক কারপেন্তিয়ার থেকে হুয়ান রুলফে পর্যন্ত সবাই সেই নিজস্ব দেশজ নির্মাণকেই বিশ্ব পাঠকের কাছে তুলে ধরেছিল। লাতিন আমেরিকার সাহিত্যের যে প্রধান বৈশিষ্ট্য, তা হল Magic Realism বা জাদু বাস্তবতা। এই আধুনিকতা তারা অন্যের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে নিজেদের মত করে গড়ে তুলছে। এই কারণেই নোবেল পুরষ্কার পাওয়ার পর গারসিকা মার্কওজ যে নোবেল লেকচার দিয়েছিলেন, সেখানে তিনি বলেছিলেন যে জাদু বাস্তবতা আর কিছুই নয় কেবল বাস্তবকে আরো খোলা চোখে দেখা। এই খোলা চোখে দেখাটা সতীনাথ ভাদুড়ি, সৈয়দ ওলিউল্লাহ, দেবেশ রায়, অমিয়ভূষণ মজুমদার, আক্তারুজ্জামান প্রমুখেরা আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন।

আর এই সাহিত্যিক সৃজনের সঙ্গে পরিচিত হতে পারলে বাংলা সাহিত্যের আধুনিকতার প্রসঙ্গে বোধিকতার কোন সমস্যার সম্মুখীন আমাদের হতে হবে না। আমাদের চিরায়ত দেশিয় আধুনিকতাকে আমরা বুঝতে পারব, আত্তীকরণ করতে পারব।

বাংলা প্রণয়কাব্যে নাটকীয়তা : প্রসঙ্গত ইউসুফ জোলেখা ও লায়লী মজনু

ডঃ মহঃ জামিলুর রহমান

সহকারী অধ্যাপক, জাকির হুসেন দিল্লি কলেজ (সান্ধ্য)

আমরা জানি, দ্বন্দ্ব হল একটি নাটকের প্রাণ। দ্বন্দ্ব ছাড়া যেকোনো নাটক সফল হতে পারে না। আর এই নাটকের মতো দ্বন্দ্ব যদি কাব্যের মধ্যে পাওয়া যায় তবে তা কাব্যকে একটি আলাদা মহিমা দান করে। প্রাক্ উপনিবেশ পর্বের বাংলা সাহিত্যের প্রণয়কাব্যে আমরা এমনই নাটকীয় দ্বন্দ্বের সন্নিবেশ দেখতে পাই, যেগুলি পাঠকের রোমাঞ্চ পিপাসি মনকে তৃষ্ণার জল যোগায়। মানুষের মন বারবার নাটকীয় দ্বন্দ্বের আঘাতে জর্জরিত হয়। ফলে তার মনে রসের সঞ্চার হয়। আমরা এই অধ্যায়ের আলোচনায় সেই রসকেই খোঁজার চেষ্টা করবো।

প্রথমেই আসি ‘ইউসুফ জোলেখা’ কাব্যটির আলোচনায়। শাহ মুহম্মদ সগীরের ‘ইউসুফ জোলেখা’ কাব্য রচনার আগে আরও চারটি কাব্য আমরা এই কাহিনীতে পাই। সেগুলি হল – বাইবেল(আদি পুস্তক), কোরান, আবুল কাশিম ফিরদৌসির ‘ইউসুফ অয়া জোলেখা,’ আব্দুর রহমান জামীর ‘ইউসুফ অয়া জোলেখা’। আমরা আমাদের আলোচনায় সেই কাব্যগুলির নাটকীয়তার সঙ্গে সগীরের কাব্যের একটি তুলনামূলক আলোচনা করার চেষ্টা করবো। ইউসুফ ও জোলেখা কেন্দ্রিক প্রতিটি কাব্যেই আমরা দেখি ইউসুফের স্বপ্নকে কেন্দ্র করে নাটকীয় দ্বন্দ্ব তৈরী হতে। আদি পুস্তকে(Old Testament) আমরা দেখি বালক ইউসুফ স্বপ্ন দেখে যে সূর্য, চন্দ্র ও এগারোটি নক্ষত্র তাকে সিজদা করছে। সে তার স্বপ্নের কথা তার ভাইদের বলা মাত্রই তারা ঈর্ষায় ফেটে পড়ে। ফলে কাব্যে নাটকীয় দ্বন্দ্ব তৈরী হয়। এরপর থেকেই ইউসুফের ভাইরা ষড়যন্ত্র শুরু করে তাকে মেরে ফেলার। ফলে কাব্যের নাটকীয়তা আরো বৃদ্ধি পাই। এই নাটকীয়তা চরম আকার নেয় যখন ইউসুফ তার পিতার কথা শুনে ভাইদের খবর নেওয়ার জন্য শিখিমে যায়। কিন্তু ততক্ষণে তার ভাইরা শিখিম ছেড়ে দোখমে চলে যাওয়ায় সেও সেখানে যায়। তার ভাইরা তাকে আসতে দেখে তাকে হত্যার পরিকল্পনা করে। তবে আমরা জানি, শেষমেষ তারা তাকে কুয়ায় ফেলে দেয়। এই ঘটনাটির নাটকীয়তা আমরা কোরানের মধ্যে আর একটু অন্যভাবে দেখতে পাই। সেখানে ইউসুফ স্বপ্ন দেখার পর শুধু তার পিতাকে তার স্বপ্ন সর্ম্পকে বলেছে এবং তার পিতা তাকে স্নেহের সঙ্গে তার

ভাইদের সামনে সেই স্বপ্নের কথা বলতে নিষেধ করেছে। সেখানে ইউসুফের ভাইরা তার স্বপ্নের কথা জানতে পারে এমন উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবুও ইউসুফের ভাইরা তার প্রতি তাদের বাবার স্নেহ বেশি দেখে তাকে মেরে ফেলার পরিকল্পনার করেছে। ফলে এখানে আমরা নাটকীয় দ্বন্দ্বের পরিবতন দেখতে পেয়েছি। শুধু তাই নয় কোরানে আমরা দেখি ইউসুফের ভাইরা পরিকল্পনা করে নিজেরাই তাকে সঙ্গে করে পশু চরাবার জন্য নিয়ে যায়। ফলে এখানে দুই কাব্যে নাটকীয়তাগত প্রভেদ স্পষ্ট। তবে শেষে তাকে কূঁয়ায় ফেলার ঘটনা দুই কাব্যেই এক। ফিরদোসীর কাব্যে ইউসুফ তার স্বপ্নের কথা প্রথমে শুধু তার পিতাকে জানায়। তার পিতা তাকে তার স্বপ্নের কথা তার ভাইদের সামনে বলতে নিষেধ করে। কিন্তু তবুও সে তার ভাইদের সামনে তার স্বপ্নের কথা বলে। আর কোরানের মতো এ কাব্যেও তার ভাইরা তাকে তাদের বাবার কাছে থেকে চেয়ে নিয়ে যায়। আর শেষে তাকে কূঁয়ায় ফেলে দেয়। সগীরের কাব্যেও আমরা দেখি তার পিতা তাকে ভাইদের কাছে স্বপ্নের কথা বলতে নিষেধ করেছে।,

“নিভৃতে ইছুক তরে করিলা নিষেধ”। (ইউসুফ জোলেখা, পৃ. ১৬২)

কিন্তু দৈব বলে তারা তা জানতে পেরে যায়। জামীর কাব্যেও এ ঘটনা এক। সগীর ও জামী উভয় কবির কাব্যেই আমরা দেখি পূর্ববর্তী কাব্যগুলির মতো তার ভাইদের ষড়যন্ত্র করতে। ফলে এক্ষেত্রে সব কাব্যেই নাটকীয়তার স্বরূপ এক। তবে সগীরের কাব্যে তারা মৃগয়া করতে বনে যায় বলে উল্লেখ রয়েছে। তারা তাদের বাবাকে মৃগয়া করতে ইউসুফকে নিয়ে যাবার কথা জানায়। এখানেও প্রথমে তিনি অসম্মত হলেও পরে সম্মতি দিয়ে দেন। আর এর ফলও শেষে অন্য কাব্যগুলির মতোই হয়।

এই কাব্যে আমরা আরেকবার কামান্ধ জোলেখাকে কেন্দ্র করে কাহিনীর নাটকীয়তাকে চরম আকার নিতে দেখি। আদি পুস্তকে আমরা দেখি ইউসুফ যখন জোলেখার কুপ্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করে তাকে ঘরে একা ফেলে চলে যায় তখন জোলেখা রাগের আগুনে ফেটে পড়ে। সে পাল্টা ইউসুফের উপরে দোষ চাপায় যে সে তার আত্মসম্মান হানি করতে এসেছিল -

“ সে নিজ ঘরের লোকদিগকে ডাকিয়া কহিল তিনি আমাদের সহিত ঠাট্টা করিতে একজন ইব্রীয় পুরুষ আনিয়াছেন, সে আমার সঙ্গে শয়ন করিবার জন্য আমার নিকটে আসিয়াছিল, তাহাতে আমি চিৎকার করিয়া উঠিলাম। আমার চিৎকার শুনিয়া সে আমার নিকটে নিজ বস্ত্রখানি ফেলিয়া বাহিরে পালাইয়া গেল।” (এনামুল হক, পৃ ৩১)

জোলেখার এই অভিযোগ কাব্যে চরম নাটকীয় দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে। কোরানের মধ্যে এই ঘটনা একটু অন্যভাবে রয়েছে। সেখানে এই ঘটনার সময় হঠাৎ জোলেখার স্বামী আজিজের উপস্থিতি নাটকীয় দ্বন্দ্বকে আরও বৃদ্ধি করেছে। ইউসুফ যখন জোলেখার কাছে থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে দরজার দিকে পালিয়ে যাচ্ছিল তখন দরজার কাছে হঠাৎ আজিজ এসে উপস্থিত হয়-

"ওয়াসতাবাকাল বাবা ওয়া কাদ্দাত কামিশাহুন

মিন দুবুরিউ ওয়াল ফায়া সাইয়েদা হালাদাল বাব" (তফসির, পৃ. ৬৬১)

(অর্থ- তারা উভয়ে ছুটে দরজার দিকে গেল এবং মহিলা ইউসুফের জামা পেছন দিক থেকে ছিঁড়ে ফেললো। উভয়ে মহিলার স্বামীকে দরজার কাছে পেল।)

ফলতঃ জোলেখা সঙ্গে সঙ্গে তার স্বামীকে ইউসুফের দোষারোপ শুরু করে। ফিরদৌসীর কাব্যেও আজিজ এভাবেই তাদের সামনে এসে হাজির হয়। কিন্তু জামী ও সগীরের কাব্যে ঘটনাটি ঘটার সময় আজিজকে সেখানে হাজির হতে দেখি নি। আবার জোলেখা তখনই ইউসুফকে দোষারোপ করার পরিবর্তে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে। তবে তার জ্ঞান ফিরলে সে আজিজের কাছে ইউসুফের নালিশ জানায়। ফলে আমরা এই ঘটনার মধ্যেও বিভিন্ন কাব্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য দেখতে পাই। আর এভাবেই বিভিন্ন কাব্যের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন নাটকীয় পরিস্থিতির সন্নিবেশ আমাদের কাছে পাঠগুলিকে আকর্ষণীয় করে তোলে।

এবার আমরা 'লায়লী-মজনু' কাহিনীটি নিয়ে আলোচনা করতে পারি। কবি দৌলত উজির বাহ্‌রাম খান বাংলায় তাঁর 'লায়লী-মজনু' কাব্যটি রচনা করার আগে তিনজন কবি ফার্সি ভাষায় এই কাব্য রচনা করেছেন। তাঁরা হলেন, নিজামি গাঞ্জাভি, আমির খুসরু, আব্দুর রহমান জামি। এখানে আমরা কবি বাহ্‌রামের কাব্য ও ফার্সি কাব্যগুলির নাটকীয়তার স্বরূপের তুলনামূলক আলোচনার চেষ্টা করবো। আলোচনার সুবিধের জন্য আমরা বাহ্‌রামের কাব্য দিয়ে আলোচনার শুরু করবো।

কবি বাহ্‌রামের কাব্যে আমরা দেখি কএস(মজনু) হল আমীরের একমাত্র সন্তান। তিনি অনেক সাধ্য সাধনা করে তাকে লাভ করেন। তাই তার যত্নের প্রতি কোন অভাব তিনি রাখেন নি। সে বড় হলে রীতি মত তিনি তাকে পাঠশালায় পাঠান। সেই পাঠশালায় কএস-এর দেখা হয় লায়লীর সঙ্গে। আর এখান থেকে কাব্যে শুরু হয় নাটকীয়তা। তারা একে অপরের প্রেমে পড়ে যায়। তারা পাঠশালার বাইরে একে অপরের সঙ্গে দেখা করা শুরু করে। ফলে তাদের প্রেমের কথা সকলের মুখে মুখে ছড়িয়ে যায়। আর তাদেরই কয়েকজন সহপাঠী তাদের পাঠশালার গুরুকে ও লায়লীর মাকে তাদের প্রেমের কথা জানায়। ফলে কাহিনীর দ্বন্দ্ব এখানে চরম আকার নেয়।

একদিকে তাদের গুরুর কাছে ভৎর্সনা শুনতে হয়, অপরদিকে পরিবারের কাছে। আবার লায়লীর মা লায়লীর পড়াশুনা বন্ধ করে তাকে গৃহবন্দী করে দেয়। বাহ্‌রাম জানান,

“অমূল্য রতন কন্যা করিয়া যতন।
পুরীর অন্তরে মাতা রাখিল তখন।।”

বলা বাহুল্য লায়লী ও মজনু উভয়েরই দুর্দশা এই সময় চরম আকার নেয়। নিজামী ও খুশরুর কাব্যে এই অংশের কাহিনীর নাটকীয়তা বাহ্‌রামের মতোই। কিন্তু জামীর কাব্যে তা একটু আলাদা। জামীর কাব্যে যেহেতু আমরা মজনুকে পাঠশালায় যেতে দেখি না শুধু লায়লা পাঠশালায় যায় তাই তাদের পাঠশালায় প্রেমে পড়ার প্রসঙ্গও আমরা পাই না। জামীর কাব্যে মজনু লায়লাকে পাঠশালায় যাওয়ার সময় দেখতে পাই। তাকে দেখেই সে প্রেমে পড়ে যায়। তারপর সে লায়লার নামে গান গেয়ে গেয়ে তার মন জয় করে। তার এই গান গাওয়া দেখেই সবাই তার নাম মজনু রাখে। তারপর তাদের বাড়ির বাইরে সাক্ষাৎ শুরু হয়। আস্তে আস্তে তাদের প্রেমের খবর লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে লায়লার বাবা এ খবর জানতে পারেন –

“খাবার ইয়াফতান পেদারে লায়লা আজ মুলাকাত কারদানে উয়ি বা মজনু ওয়া সিয়াসত কারদান উয়ি বার অন” (পৃ.২৮৩, ইউসুফ জোলেখা আজ হাফত আওরাঙ্গে জামি)

(অর্থ- লায়লার বাবার কাছে মজনুর সঙ্গে তার সাক্ষাতের খবর যায় ও তিনি তাকে সে কারনে বন্দী করে দেন।)

লক্ষনীয় যে বাহ্‌রামের কাব্যে যে কাজটি করেছিল লায়লীর মা, জামীর কাব্যে সেই কাজটি করেছে তার বাবা। কিন্তু নাটকীয় দ্বন্দ্বের সৃষ্টিতে উভয় কাব্যেই একই রকম অনুঘটক কাজ করেছে তা হল লোকমুখে তাদের প্রেমের চর্চা ও নিন্দা। আবার এই নিন্দার ভয়ই আরেকটি অনুঘটকের সৃষ্টি করে – তা হল লায়লীর বন্দীত্ব। ফলে এই দুই অনুঘটকের সম্মিলনে কাব্যে নাটকীয়তা চরম আকার নেয়।

‘লায়লী মজনু’ কাহিনীতে নওফিলের ভূমিকাও কাহিনীর নাটকীয়তা বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছে। নিজামীর কাব্যতে আমরা দেখি নওফিল এক কাবিলার সর্দার ও খুব ধনবান ব্যক্তি। নজদ বনের যেদিকে মজনু পাগল প্রায় হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল সেদিকে তিনি একদিন হরিণ শিকারে যান। তিনি সেখানে মজনুকে দেখতে পান। তিনি মজনুর তীব্র প্রেমের কথা শুনে ও তার করুণ অবস্থা দেখে প্রতিজ্ঞা করে বসেন যে যেভাবেই হোক তিনি মজনুর সঙ্গে লায়লার বিয়ে দেবেন। বলা যায় তাঁর এই প্রতিজ্ঞা কাহিনীতে এক চরম নাটকীয় দ্বন্দ্বের সূচনা করে। কেননা নওফিল একদিকে এক কাবিলার সর্দার অপরদিকে লায়লার পিতা একটি ধনী কাবিলার ধনবান ব্যক্তি। আর লায়লার পিতা ইতিমধ্যেই মজনুর পাগলামীর জন্য তার পিতাকে এই বিয়েতে না করে দিয়েছিলেন। এমতাবস্থায়

নওফিল দলবল নিয়ে লায়লাদের কাবিলার সামনে গিয়ে হাজির হয়। তিনি তাদের চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলেন লায়লাকে তাদের দিয়ে দিতে; তা না হলে লড়াইয়ের জন্য তৈরি থাকতে। তার এই চ্যালেঞ্জ একটি ধনী পরিবারের পক্ষে স্বীকার করায় স্বাভাবিক ছিল। ফলে দেখা যায় উভয় পক্ষের যুদ্ধ। প্রথম বারের এই যুদ্ধে হেরে গিয়ে নওফিল সন্ধি করে নেয়। কিন্তু দ্বিতীয়বার প্রচুর দলবল নিয়ে সে লায়লার কাবিলাকে আবার আক্রমণ করে ও জয়লাভ করে। কিন্তু হেরে যাওয়া সত্ত্বেও লায়লার বাবা একজন পাগলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে অস্বীকার করেন। ফলে শেষমেষ নওফিল একজন পিতার জিদের কাছে হেরে যায়। খুশরু ও জামীর কাব্যেও নওফিল এরকমই ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। তবে এর পরিবর্তন দেখা যায় বাহ্‌রামের কাব্যে। বাহ্‌রামের কাব্যে নওফিল মজনুকে ‘মিলাইমু তোহ্মাক লায়লী প্রিয়া সনে’ (পৃ. ১৮২) বললেও লায়লাকে দেখে নিজেই তার প্রেমে ডুবে যায়। ফলে এই কাব্যের নাটকীয়তা অন্যদিকে বাঁক নেয়। সে নিজেই মজনুকে মেরে ফেলার চক্রান্ত করে,

“সেবকেরে তবে তার ইঙ্গিতে কহিল।
মধুর কটোরা আন মোহোর কারণ
গরল কটোরা আন মজনুর কারণ।” পৃ. ১৮৯

কিন্তু নিজের চক্রান্তে সে নিজেই ধরা পড়ে। মধু ও বিষ পরিবেশনের ভুলে সে নিজেই বিষ খেয়ে মারা যায়। সুতরাং উপরোক্ত আলোচনাতে এটা স্পষ্ট যে কাহিনীর নাটকীয়তার ভিন্ন ভিন্ন স্বাদ ‘লায়লী মজনু’ কাব্যের বিভিন্ন পাঠ থেকে পাওয়া যায়।

সহায়ক গ্রন্থাবলী –

এথ, হারমান। ইউসুফ অ্যান্ড জোলেখা, অক্সফোর্ডঃ দি ক্লারেন্ডন প্রেস, ১৯০৮

আহমেদ, ওয়াকিল. বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান, ঢাকা : খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ২০০৯

তফসিরে মারেফুল কুরান, অনুবাদ ও সম্পাদনা মাওলানা মুহিউদ্দিন খান, খাদেমুল হারামাইন

পুর, নাদিরুদ্দিন। ইউসুফ জোলেখা আজ হাফত আওরাঙ্গে জামি, তেহরানঃ চাপখানায়ে সেপহর,২০৩৬

হক, মুহাম্মদ এনামুল। *ইউসুফ-জোলেখা,* ঢাকা : মওলা ব্রাদার্স, ২০০৯

শরীফ, আহমদ। *লায়লী-মজনু,* ঢাকা : মওলা ব্রাদার্স, ২০১০

হারানের নাতজামাই – একটি সমীক্ষা

ডঃ শ্রীতা মুখার্জী

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

জাকির হুসেন দিল্লি কলেজ (সান্ধ্য)

‘কল্লোল’ এবং ‘কালিকলম’ পত্রিকায় যে বিদ্রোহ মূর্ততা লাভ করেছিল, তারই আদর্শ এবং প্রভাবকে শিরোধার্য করে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের জগতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তবে কল্লোলীয় আদর্শকে সংযম, শাসন ও চিন্তায় তিনি এক ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত করেছিলেন। নিরাসক্ত চিত্ততা এবং বৈজ্ঞানিক নির্মোহ নিয়ে সাহিত্য সাধনায় রত হন এই বাস্তববাদী লেখক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে যদি মধ্যবিন্দু হিসাবে ধরা হয় তাহলে দেখা যাবে যুদ্ধ পরবর্তীকালে বদল এসেছে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পের নিজস্ব চরিত্রে। যুদ্ধের পূর্বেকার গল্পে যেমন স্থান করে নিয়েছে জীবনের আদিমতা ও জৈবতাড়না, তেমনই যুদ্ধোত্তর গল্পে রয়েছে সমষ্টিগত মানুষের সমাজ গঠনের পরিকল্পনা। এরকমই একটি গল্প হল ‘হারাণের নাতজামাই’ ।

১৯৪৮ সালে প্রকাশিত ‘ছোটবড়’ গ্রন্থের অন্তর্গত গল্প হল ‘হারাণের নাতজামাই’ । সংঘবদ্ধ মানুষের সোচ্চার প্রতিবাদী ভূমিকাই হল এই গল্পের মূল সুর। মূল কথাবস্তুর মধ্যে দিয়ে লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ন্যায্য কৃষক আন্দোলনের সূক্ষ্ম আভাস দিয়ে যান। এই গল্প লেখার কিছু সময় আগেই ঘটে গেছে রক্তক্ষয়ী তেভাগা আন্দোলন। গল্পে তাকেই যেন শিল্পরূপ দান করা হয়েছে। গল্পের মধ্যে পরোক্ষভাবে রাজনৈতিক আন্দোলন তেভাগার নামোল্লেখ করা হয়েছে, “শীতের তেভাগা চাঁদের আবছা আলোয় চোখ জ্বলে ওঠে চাষীদের...’।

গল্পের কথাবস্তুতে খুব কিছু বিশেষত্ব নেই। সহজ-সোজা গদ্যে, কলমের কিছু সূক্ষ্ম আঁচড়ে সমগ্র পটভূমিকে জীবন্ত করে তুলেছেন গল্পকার। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি যেন বইয়ের পাতা থেকে বেরিয়ে মিশে যেতে থাকে গ্রাম্য খেটে খাওয়া মানুষের কাঠামোর মধ্যে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘হারাণের নাতজামাই’ হল গ্রামবাংলার কৃষকদের সংঘবদ্ধ প্রতিবাদের কাহিনী। এই গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র হল ‘ময়নার মা’ । ময়নার মা কিভাবে বুদ্ধি করে কৃষক বিদ্রোহের নেতা ভুবন মন্ডলকে পুলিশের হাত থেকে বাঁচায়, এই গল্পে সেকথাই বলা হয়েছে।

ভুবন মন্ডল কৃষকদের অধিকারের জন্য লড়াই করে। স্থানীয় মহাজন ও নেতারা যখন ভাগ বসাতে আসে কৃষকদের ধানের ওপর, তখন কৃষকদের ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলে, তাদের একজোট করে ক্ষমতাবান এই শ্রেণীর সঙ্গে লড়াই-এ নেমেছে ভুবন মন্ডল। তাই পুলিশ লেগেছে ভুবন মন্ডলের পেছনে। ভুবন এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রাম পালিয়ে বেড়ায়। গ্রামবাসীরা আশ্রয় দিয়ে তাকে রক্ষা করে।

এরকমই একদিন হঠাৎ করেই ভুবন মন্ডল আশ্রয় নেয় বৃদ্ধ হারাণের বাড়িতে। হারাণের বয়স আশির ওপরে। সে কানে শোনে না। ভুবনকে আদর করে বাড়িতে ডেকে নিয়ে গেছে হারাণের মেয়ে 'ময়নার মা' । সে হল এক বিধবা মহিলা। তবে সে সাহসী, রসিকা ও বুদ্ধিমতী। সেসময় শ্বশুরবাড়ি থেকে কিছুদিনের জন্য বাপের বাড়ি থাকতে এসেছিল তার মেয়ে ময়না। আর বাড়িতে আছে ময়নার মায়ের বিশ বছরের জোয়ান ছেলে।

সেদিন মধ্য রাত্রে গ্রামেরই কোন এক গুপ্তচরের থেকে গোপনে খবর সংগ্রহ করে পুলিশের বড়কর্তা মন্মথ হারাণের বাড়িতে এসে হানা দিল ভুবন মন্ডলের খোঁজে। পুলিশের লোক বাড়ি ঘিরে ফেলেছে। পালানোর পথ নেই ভুবনের। এই অবস্থায় বুদ্ধি বের করল ময়নার মা। ভুবনকে সে নিজের জামাই জগমোহনের ভূমিকায় অবতীর্ণ করল। নতুন শাড়ি পড়িয়ে মেয়ে ময়নাকে ভুবনের পাশে দাঁড় করালো ময়নার মা। তার অভিনয় দক্ষতায় পুলিশের বড়বাবু মন্মথর পর্যন্ত মনে হল সত্যি বুঝি ভুবন মন্ডল এ বাড়ির জামাই। তারা তাহলে এখানে ভুবনের আসার ভুল খবর পেয়েছে। শীতের রাতে আলুথালু বেশে থাকা ময়নাকে পুলিশের বিশ্বাস পেতে ভুবনের সাথে জোর করে বিছানায় শুতে যেতে পাঠাতেও একটুও বুক কাঁপল না ময়নার মায়ের। কোন প্রমাণ না পেয়ে খালি হাতে ফিরে যেতে হল মন্মথকে।

এদিকে ওই ঘটনা ঘটার সময় সেদিন মাঝরাতে সারা গ্রামের লোক ভিড় করেছিল ময়নার মায়ের বাড়িতে। কৃষকদের হাতে ছিল অস্ত্র। তারা ভেবে এসেছিল পুলিশ জোর করে তাদের নেতাকে ধরতে চাইলে তারা সরাসরি লড়াই-এ নামবে। কিন্তু ময়নার মায়ের সাহস আর বুদ্ধির ফলে তেমন কিছু হল না দেখে লোকে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়ল ময়নার মায়ের বুদ্ধিমত্তার কাহিনী। পুলিশ ঠকানোর গল্প।

এদিকে এ গল্প যখন জগমোহনের কানে উঠল, সে উপস্থিত হল শ্বশুরবাড়িতে। বউ আর শাশুড়ির বুদ্ধির তারিফ করার পরিবর্তে তাদের সঙ্গে সম্মুখ-সমরে প্রস্তুত হল জগমোহন। অহেতুক চরিত্রের কথা তুলে ময়নাকে কাঁদাল। কারণ সে কিনা সেদিন রাত্রে ভুবনের সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীর অভিনয় করেছিল, এক বিছানায় শুয়েছিল। ময়নার মায়ের কোন যুক্তি সে কানে তুলল না। এমনকি রাগের মাথায় ময়নাকে ত্যাগ দেবার কথাও বলে বসল। তারপর রাগ একসময় কমল। বুদ্ধি করে তখন ময়নার মা তার কানে তুলল পুলিশের লোককে সে রাতে বোকা বানিয়েছিল বলে তার পরদিন পুলিশ রাগ মেটাতে, তাদের উচিত শিক্ষা দিতে, ময়নার ভাইকে তুলে নিয়ে গেছে। নাতির শোকে বৃদ্ধ হারাণ শয্যাগত প্রায়। জগমোহন ভাবতে বসল কি করা যায়।

এমন সময় সন্ধ্যার মুখে বাড়িতে পুলিশ আবার হানা দিল। মন্মথ এল সদলবলে। বাড়ির সব লোককে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে চলল সে। এরই মধ্যে যুবতী ময়নার চরিত্র সম্পর্কে মন্মথ অশালীন ইঙ্গিত করাতে ক্ষিপ্ত জগমোহন তার প্রতিবাদ করল। এ ঘটনা বুঝিয়ে দিল ময়নাকে মনে মনে জগমোহন কত ভালবাসে। আবার

পুলিশের হাতে মার খেয়ে জগমোহনের মুখ দিয়ে রক্ত ঝরলে, আঁচল দিয়ে সে রক্ত মুছিয়ে দেয় ময়না। কাহিনীর এই দৃশ্য স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের অটুট বন্ধন ও প্রেমকেই প্রকাশ করে। মানবিক সম্পর্কের উত্তরণের মধ্য দিয়েই শেষ হয়েছে এই গল্প। অথবা শেষ হয়নি। বরং অসম্পূর্ণ ইঙ্গিতবাহী এই সমাপ্তিই পাঠককে বাধ্য করেছে ভাবতে যে ভবিষ্যতে শাসকের দমননীতির বিরুদ্ধে কোন অস্ত্র জনতা শানিয়ে তুলতে পারে।

প্রথম থেকেই এই গল্পের মুল সুর হয়ে উঠেছে জনতার প্রতিবাদ। শেষে এসেও দেখা যায়, হারাণ, ময়নার মা, ময়না, জগমোহনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ যখন থানায় নিয়ে যেতে চায়, তখন তাদের পথ আটকে ধরে গ্রামবাসী। দলে দলে ছুটে আসতে থাকে মানুষ। শুধু এই গ্রাম নয়, আশপাশের গ্রাম থেকেও। তারা পুলিশী অত্যাচারের প্রতিবাদ করে। দুর্বল, অসহায় হয়েও দলবেঁধে তারা ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে পুলিশের ওপর, কেবল হারাণের পরিবারকে পুলিশের কোপ থেকে বাঁচাতে। কারণ নিজেদের বিপদের মধ্যে ফেলেও কৃষক-বিদ্রোহের নেতা ভুবন মন্ডলের প্রাণ বাঁচিয়েছে ময়নার মা ও তার গোটা পরিবার। চরম বিপদের মুহূর্তে নিজের মেয়ের ক্ষুদ্র সম্মানের থেকে তার কাছে বড় হয়ে উঠেছিল গ্রামবাসীদের স্বার্থ। কৃষক বিদ্রোহের নেতা ভুবন মন্ডলকে পালানোর সুযোগ করে দিয়ে বিপ্লবের পতাকাকে উড়িয়ে দিয়েছে ময়নার মা। আত্মস্বার্থ ত্যাগের এই বিরল নজির প্রদর্শনের কারণেই সে আজ পাশে পেয়েছে হাজার-হাজার মানুষকে। আর পুলিশের কর্তা মন্মথ জনজাগরণের এই চেহারা দেখে ভয় পেয়ে গেছে। জনতার এই আক্রমণের সামনে সে হার মেনে নেয়। এ যেন হল সততার জয়, মানুষের জয়, আদর্শের জয়।

তাই প্রকৃত বিচারে বলা চলে ‘হারাণের নাতজামাই’ হল জনজাগরণের গল্প। জনসচেতনতার গল্প। এই গল্প বিপ্লব ও একতার কথা বলে। এবং ‘ময়নার মা’ -এর মত চরিত্রের সাহায্যে লেখক যেন সাধারণ মানুষকে দেশের জন্য, জাতির জন্য, সমাজের জন্য নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে বৃহৎ কিছু দায়িত্ব পালন করতে বলেছেন।

এমনই ঘনপিনদ্ধ কাহিনী বলে চলেন লেখক যেখানে ঘটনার টানে ঘটনা যেন আপনি চলে আসে। এক পুলিশী হানা থেকে অপর পুলিশী হানায় গল্প শেষ হয়েছে। রাজনৈতিক প্রসঙ্গ এখানে সরাসরি উত্থাপিত হয়নি। সামাজিক বদলকে নিজের অঙ্গে বিধৃত করেছে ‘হারাণের নাতজামাই’ । বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে গ্রাম্য জনতা চরিত্রের ‘প্যানোরামিক’ ছবি এঁকে সমষ্টির জয়কেই চিহ্নিত করতে চেয়েছেন লেখক। এই গল্প মনে পড়িয়ে দেয় কবি দীনেশ দাসের ‘কাস্তে’ কবিতার কথা। মাটিতে সোনার ফসল ফলানো নিরীহ কৃষকের নিষ্পেষণ ও তৎপরবর্তী প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের আহ্বান সেই কবিতাতেও স্পষ্টতই উচ্চারিত হয়েছে।

চরিত্র গল্পের প্রাণ স্বরূপ। খুব স্বল্প পরিসরে গল্পকার চরিত্রের মাধ্যমে নিজের ভাবনাকে মূর্ততা প্রদান করেন। ‘হারাণের নাতজামাই’ গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্রগুলি হল যথাক্রমে ময়নার মা, ময়না, ভুবন মন্ডল, জগমোহন, হারাণ। চরিত্রগুলি বাস্তবোচিত। আবেগের আতিশয্য বা বাড়তি মেদ-মাংস কোথাও লক্ষ্য করা যায়নি। যদিও এ হল একক নায়কের সক্রিয়তা ও হিরোইক আচরণের টিপিকাল মিথকে ভেঙে বেরিয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমষ্টির কথা বলতে চাওয়ার প্রয়াস, তবু ‘ময়নার মা’ চরিত্রটি পাঠকের দৃষ্টি এড়ায়না। গল্পের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হল ‘ময়নার মা’। সমগ্র বাংলা সাহিত্যের প্রেক্ষিতে ‘ময়নার মা’ চরিত্রটি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক অনবদ্য সৃষ্টি। নারীসুলভ ক্ষিপ্রতা, অশিক্ষিত পটুত্ব, মেয়েলী ভাষার প্রয়োগ ও বুদ্ধির বিচ্ছুরণ – সব মিলিয়ে সে হয়ে উঠেছে বিপ্লবের প্রতিমূর্তি। একেবারে ঘাসফুল স্তরের অভাবী সংসারের প্রতিনিধি ময়নার মা। সে বিধবা। সংগ্রামে রত এই মহিলার চেহারার বর্ণনা লেখক দু-একটি আঁচড়ে দিয়েছেন। তা আসলে তার ব্যক্তিত্বের রূপক হয়ে উঠেছে। অসাধারণ সাহসী বলেই প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েও সে নিখুঁত অভিনয় করে যেতে পেরেছে। বিপ্লবের স্বার্থে ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও তার নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত হতে দিতেও রাজি ময়নার মা। ব্যক্তিস্বার্থ সমগ্রের সামনে ক্ষুদ্র, সামান্য, তুচ্ছ মনে হয়। এই ব্যতিক্রমী চরিত্রকে কোন ব্যক্তিনামে ভূষিত না করে ‘ময়নার মা ’ হিসাবে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার পেছনে লেখকের এক বিশেষ উদ্দেশ্য কাজ করেছে। বিশেষ কোন নাম-পরিচয়ে বেঁধে না রেখে তাকে সর্বহারা আন্দোলনের এক নির্বিশেষ চরিত্র হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে, অনেকটা গোর্কির ‘মাদার’ উপন্যাসের মতো, মানুষের ভিড়ে যাকে সবসময় পাওয়া যাবে। ময়নার মা অত্যন্ত সক্রিয় চরিত্র বলেই হয়ত তার সাথে তাল রাখতে অপর নারীচরিত্র ময়নাকে প্যাসিভ চরিত্র হিসাবে দেখানো হয়েছে। সে কেবল দ্বিধাকম্পিত চিত্তে মায়ের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে গেছে। ময়নার মা-এর সামনে, এমনকি কৃষক বিদ্রোহের নেতা ভুবন মন্ডলকেও যেন কিছুটা নিষ্ক্রিয় মনে হয়েছে। নাতজামাই ‘জগমোহন’ চরিত্রটি একেবারেই স্বাভাবিক রঙে চিত্রিত। স্ত্রীর সতীত্ব নিয়ে সন্দিহান হয়ে ওঠা বা শাশুড়ির সঙ্গে বাক্‌বিতন্ডার মধ্যে দিয়ে সে ভালো-খারাপ মেশানো এক রক্তমাংসের মানুষ হয়ে উঠেছে। গল্পের একেবারে শেষে যখন জগমোহন মদ্যপ, চরিত্রহীন দারোগা মন্মথর আচরণের প্রতিবাদ করে, তখন সে হয়ে উঠেছে এক সক্রিয় প্রতিবাদী চরিত্র। এভাবেই ময়নার স্বামী জগমোহন এক ক্রমপরিবর্তমান চরিত্র রূপে গল্পে অবস্থান করে। ‘হারাণের নাতজামাই’ -এর অপর সক্রিয় চরিত্র হল থানার দারোগা মন্মথ। যদিও সে বিরোধী পক্ষের পুরুষ চরিত্র। শিক্ষিত, শৌখিন, মদ্যপানে অভ্যস্ত স্থানীয় থানার দারোগা মন্মথ পুলিশী হানা ও তদন্তের কাজে গ্রামে এসেছে। নারীলোভী এই পুরুষের মনে রঙ আর চোখে ধাঁধা লাগায় যুবতী ময়নার অবিন্যস্ত বেশবাস। যদিও এ ছিল বৃদ্ধ হারাণের বাড়িতে ময়নার মায়ের নির্দেশে ঘটে চলা অভিনয়ের অঙ্গমাত্র। মন্মথ চরিত্রকে বুর্জোয়া ধনতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রতিনিধি হিসাবে দেখাতে চেয়েছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। গ্রামে তল্লাসী চালাতে এসে ময়নার মায়ের বুদ্ধির কাছে হার মেনে কৃষক বিদ্রোহের নেতা ভুবন মন্ডলকে চিনতে না পেরে প্রথম রাতে খালি হাতে ফিরতে হয়েছে মন্মথকে। তবে এখানেই

গল্প শেষ হয়ে যায়নি। বৃহত্তর সংগ্রামের ছবি আঁকার সংকল্পে স্থিত লেখক গল্পের ফ্রেমে আবার ফিরিয়ে এনেছেন মন্মথকে। নিজের ভুল বুঝতে পেরে পরদিন আবার হারাণের বাড়িতে সশস্ত্র পুলিশ দল নিয়ে এসে হানা দেয় মন্মথ। গ্রেফতার করে হারাণসহ গোটা পরিবারকে। তার এই আচরণই প্রত্যক্ষত গোটা গ্রামের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে সম্মুখ সমরের জন্য প্রস্তুত করেছে। এই যুদ্ধের আভাস দিয়েই গল্পকার গল্প শেষ করেছেন। সবশেষে বলা যায় ভুবন মন্ডলের কথা। গোটা গল্পে অন্যতম প্রধান চরিত্র ভুবন মন্ডলকে খুব অল্প সময়ের জন্য পাওয়া গেছে। সে কৃষক আন্দোলনের নেতা। গল্পের কাহিনীবৃত্তে তার মুখে সংলাপ বা ক্রিয়া প্রত্যক্ষত তেমন না থাকলেও, এ কথা বুঝতে পাঠকের ভুল হয় না যে পরোক্ষে থেকেও সে গ্রাম্য চাষা-ভূষো মানুষের মনে বিপ্লবের মশাল জ্বেলে দিয়েছে। ময়নার মায়ের মতো আটপৌরে চাষি ঘরের মেয়ে-বউদের শিখিয়েছে নিজের অধিকার ও মর্যাদা রক্ষায় অস্ত্র ধরতে। হারাণ হল এক পার্শ্বিক চরিত্র। সে পোড় খাওয়া ভাগ্যতাড়িত মানুষ। দরিদ্র সর্বহারা শ্রেণীর অসহায়তা দৈবনির্ভরতার ছবি প্রকট হয় হারাণ চরিত্রে। এভাবেই ছোটবড় অসংখ্য চরিত্রের সমাবেশ গল্পের মূল কাহিনীকে পরিপুষ্ট করে তুলেছে।

‘হারাণের নাতজামাই’ গল্পে রাজনীতির উত্তাপ থাকলেও এটি মোটেই রাজনৈতিক আদর্শের গল্প নয়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় হয়ত সচেতন ভাবেই একে সমাজ সমস্যামূলক গল্পের শ্রেণীতে রাখতে চেয়েছেন। এই গল্প শোষক-শোষিতের সমস্যা-বিরোধ-প্রতিবাদের কথা বলে। গল্পের কোনো স্থানে কাহিনীর অতি বিস্তার নেই। চরিত্ররা নির্মেদ। শোষণের বিরুদ্ধে শোষিতদের সংগ্রামের দ্যোতনাতে গল্পটি শেষ হয়েছে। মন্মথর পরোক্ষ পরাজয়, জগমোহনের প্রত্যক্ষ প্রতিবাদ এবং হারাণের নিষ্ফল আবেদনকে ছাপিয়ে উপসংহার অংশে জনতা চরিত্র প্রধান হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের একাধিক নাটকেও এই জনতা চরিত্রকে প্রধান বলে চিনিয়ে দেওয়া হয়েছে। সামগ্রিক শক্তির ওপর ভরসা থেকে এই কনসেপ্ট উঠে আসে। ‘হারাণের নাতজামাই’ -ও তার ব্যতিক্রম নয়। ব্যক্তি থেকে সমগ্রতায়, এক থেকে অনেকের মধ্যে ছড়িয়ে যেতে থাকা বিপ্লবের চিত্র প্রদর্শনই ছিল লেখকের মূল উদ্দেশ্য। সংক্ষিপ্ত সংলাপ, আঞ্চলিক গ্রাম্য উপভাষার প্রয়োগ গল্পকে করে তোলে মৃত্তিকাগন্ধী। এভাবেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ‘হারাণের নাতজামাই’ গল্পে স্বকাল-স্বদেশের এক চালচিত্র সার্থক ভাবে তুলে ধরেছেন।

সহায়ক গ্রন্থাবলী –

দত্ত, বীরেন্দ্র। বাংলা ছোটগল্প প্রসঙ্গ ও প্রকরণ – প্রথম খন্ড, কলিকাতা ঃ পুস্তক বিপণি, ২০১৩ মে (সপ্তম মুদ্রণ)

মজুমদার, সমরেশ। একশ বছরের সেরা গল্প, কলিকাতা ঃ মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ১৯৯৪

গিরি, ডঃ সত্যবতী ও মজুমদার, ডঃ সমরেশ (সম্পাদনা)। প্রবন্ধ সঞ্চয়ন , কলিকাতা : রত্নাবলী, ১লা বৈশাখ ১৪১৬/১৫ এপ্রিল ২০০৯ (দ্বিতীয় মুদ্রণ)

দাশ, শিশিরকুমার। বাংলা ছোটগল্প , কলিকাতা : দে’ জ পাবলিশিং, ১৯৬৩ অক্টোবর

বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ অসিতকুমার। বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত , কলিকাতা : মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ ১৯৬৬, পুনর্মুদ্রণ ১৯৯৮-১৯৯৯

দত্তভৌমিক, গোপা। গল্প উপন্যাসের পাঠপ্রসঙ্গ , কলিকাতা : অবভাস, জানুয়ারি ২০০৬

রক্তকরবী ও রবীন্দ্রনাথ : নাট্যকার যখন মঞ্চনির্দেশক

ডাঃ সেখ মোফাজ্জল হোসেন

সরকারি অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

সামসি কলেজ

নাটকের লিখিতরূপ মঞ্চাভিনয়ের মধ্য দিয়ে সার্থকতা খুঁজে পায়। সে ক্ষেত্রে নাট্য উপস্থাপনার জন্য মঞ্চ এবং তার সঙ্গে মঞ্চনির্দেশনার ব্যাপারটিও চলে আসে। নাটক যেহেতু লোকক্রিয়ার অনুকরণ সুতরাং মঞ্চাভিনয়ের মধ্যেও তাতে যুক্ত থাকবে স্থান ও কালের মাত্রা। রক্তকরবী নাটকের মধ্যেও মঞ্চনির্দেশনা, স্থান ও কালের মাত্রা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে।

রক্তকরবী নাটকের মঞ্চ নির্দেশনার ক্ষেত্রে রঙ্গমঞ্চ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের একটি সুনির্দিষ্ট ভাবনা প্রকাশ পেয়েছে। ১৯ শতকের রঙ্গমঞ্চকে পাশ্চাত্য ধারার অনুকৃতি থেকে সরিয়ে এনে নতুন ভাবনা তাতে চারিত করেছে। 'রঙ্গমঞ্চ' প্রবন্ধে দেশজ অভিনয়রীতির (যাত্রারীতি) সঙ্গে নাট্যকলাকে মিশিয়ে নেওয়ার কথা বলেছেন। কেননা এখানে তাঁর মতে দর্শক ও অভিনেতার মধ্যে দূরত্ব কমে এবং অভিনয়টি সুহৃদয়তার সঙ্গে সম্পন্ন হয়। মঞ্চ-নির্দেশনার ক্ষেত্রে যে গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেন- “ক্ষণে ক্ষণে দৃশ্যপট ওঠানো-নামানোর ছেলে মানুষিকে আমি প্রশ্রয় দিইনে।"- রক্তকরবীর মঞ্চ-নির্দেশনা এ-ভাবধারার রূপান্তর যেন। কিন্তু নাটকের মঞ্চ নির্দেশনার ক্ষেত্রে মঞ্চসজ্জার জড় উপাদান শুধুমাত্র কৃত্রিম বাস্তবতার প্রকাশক নয়, তা আসলে নাটকীয় ঘটনার পারম্পর্যকে বজায় রেখে সচল অভিনেতার সঙ্গে জড় পদার্থের দ্বারা তৈরী পরিবেশকে সম্পর্কযুক্ত করে গতিশীলতা এনে নাটকের বক্তব্যকে

দর্শকমনে সঞ্চারিত করতে সাহায্য করে। রক্তকরবীর মঞ্চনির্দেশনা বক্তব্য উপস্থাপনার ক্ষেত্রে এমনটি করেছেন নাট্যকার।

রক্তকরবী নাটকে মঞ্চসজ্জা নানাস্তরে বিন্যস্ত। আর এই স্তর বিন্যাস হয়েছে নাট্যক্রিয়ার প্রয়োজন মেনেই। সমগ্র নাটকটি ঘটেছে যক্ষপুরীতে ও একটি দৃশ্যে। নাটকটির শুরুতেই এ নাটকের মঞ্চনির্দেশনার সম্পর্কে বলা হয়েছে— "এখানকার রাজা একটি অত্যন্ত জটিল আবরণের আড়ালে বাস করে। প্রাসাদের সেই জালের আবরণ এই নাটকের একটি মাত্র দৃশ্য। সেই আবরণের বহির্ভাগে সমস্ত ঘটনা ঘটিতেছে।" নাট্য পরিচয় অংশে মঞ্চনির্দেশনার ক্ষেত্রে এই জালের এবং রাজা যে কোন ঘরে বদ্ধ তার একটি নির্দেশ পাওয়া যায় তার সমস্তটাই এই রাজমহলের জালের জানালার বাহির বারান্দায়। ভিতরে কী হচ্ছে তার অতি অল্প আমরা জানতে পারি। আর এই 'জাল' জাল নয়। নয় কেননা রাজার এই জাল ভেদ করে বের হয়ে আসা "আসলে চারিদিকের পীড়নের ভিতর দিয়ে আত্মপ্রকাশ।" সুতরাং মঞ্চ নির্দেশনার ক্ষেত্রে বিশেষায়িত নয় এমন জাল (সুতোর ঘর ঘর খোপ বিশিষ্ট), আসলে চারিদিকের পীড়নের, অপ্রকাশ ও আত্মপ্রকাশের মাঝের বাধা এই ভাবসূত্রের নির্দেশক। জাল তাই এভাবে জড় হয়েও মূল ভাবনার সাথে গ্রথিত হয়। সুতরাং রাজার বদ্ধস্থানের জালের জানালা ও বারান্দা মঞ্চ নির্দেশনার প্রথম স্তর ।

এই নাটকের মঞ্চসজ্জার প্রথম স্তর স্পষ্টভাবে চিত্রিত হলেও এটি মঞ্চসজ্জার সম্পূর্ণরূপ নয়। নাট্যক্রিয়ার মধ্যে আরো মঞ্চনির্দেশনার আভাস আছে। মঞ্চ নির্দেশনার ক্ষেত্রে একটি স্থায়ী সুড়ঙ্গ-মুখের আভাসের কথা আমরা নাট্যঘটনার মধ্যে দিয়ে পাই। যেমন—

- নাট্যের শুরুতে নন্দিনীকে রক্তকরবী দিতে এলে নন্দিনী কিশোরকে বলে- *যা যা এখনই কাজে ফিরে যা, দেরি করিস নে। নাট্য পরিচয় অংশে বলা হয়েছে যে জায়গাটার কথা হচ্ছে, সেখানে যক্ষের ধন পোতা আছে। তাই সন্ধান পেয়ে পাতালে সুড়ঙ্গ খোদাই চলছে।' আর কিশোর সুড়ঙ্গ খোদাই বালক। সুতরাং তাকে আবার কাজে ফিরে যাবার জন্যে বলা আসলে তাকে সুড়ঙ্গের মধ্যে যেতে বলা। এবং কিশোর 'না না আমি সামলে চলব না, চলব না' বলে দ্রুত প্রস্থান করে সেই সুড়ঙ্গের মধ্যে।
- 'প্রেতপুরীর দরজা খুলে গেছে নাকি। ঐ কারা চলেছে প্রহরীদের সঙ্গে। ঐ যে বেরিয়ে আসছে...'। প্রহরী বেষ্টিত হয়ে সুড়ঙ্গ খোদাইকররা বার হয়ে আসছে। এবং নন্দিনী তাদের চেনে। কেননা তাদের মধ্যে অনুপ, উপমন্যু, শলকু, কছু—তাদের পাশের গাঁয়ের লোক। অধ্যাপককে সে একথা বলেছে।

সুতরাং নাট্য-ঘটনায় একটি সুড়ঙ্গ-মুখের কথা আছে। মঞ্চনির্দেশনার ক্ষেত্রে এটি দ্বিতীয় স্তর। এছাড়া আরো একটি স্তর আছে মঞ্চ সজ্জার। সেখানে নলিনী রাজার সঙ্গে নয়, 'ও' পাড়ার ফাগুলাল, কিংবা 'ফ' পাড়ার বিশুর সঙ্গে কথা বলে। বলে অধ্যাপকের সঙ্গে। সেখানে আছে ট, ঠ, ণ, ন, হ ক্ষ পাড়া। আছে ছোট বড় ভেদ। সেখানে আছে সর্দার, মেজ সর্দার, ছোট সর্দার। সেখানে যান্ত্রিক নিষ্প্রাণ জগত নন্দিনীর প্রাণের ছোঁয়ায় মুক্তি পায়। এটি তৃতীয়ঙ্কর মঞ্চসজ্জার এবং শেষে সবাই চারিদিকের পীড়ন ভেঙে একটি ক্ষেত্রতটে মিলিত হয়ে ছোটে সামগ্রিক মুক্তির দিকে। এই ক্ষেত্রতট মঞ্চের চতুর্থস্তর। রাজা বন্ধন ভেঙে আসে এখানে। নন্দিনী তাকে নিয়ে আসে। আসে ফাগুলাল, বিশু, অধ্যাপক একে একে। তারা চলে আবহমান কালের মুক্তির খোঁজে। পরম প্রাণের সন্ধানে।

-এ থেকে আমরা রক্তকরবী মঞ্চ-নির্দেশনার ক্ষেত্রে একটি গ্রাফ তৈরী করতে পারি এভাবে—

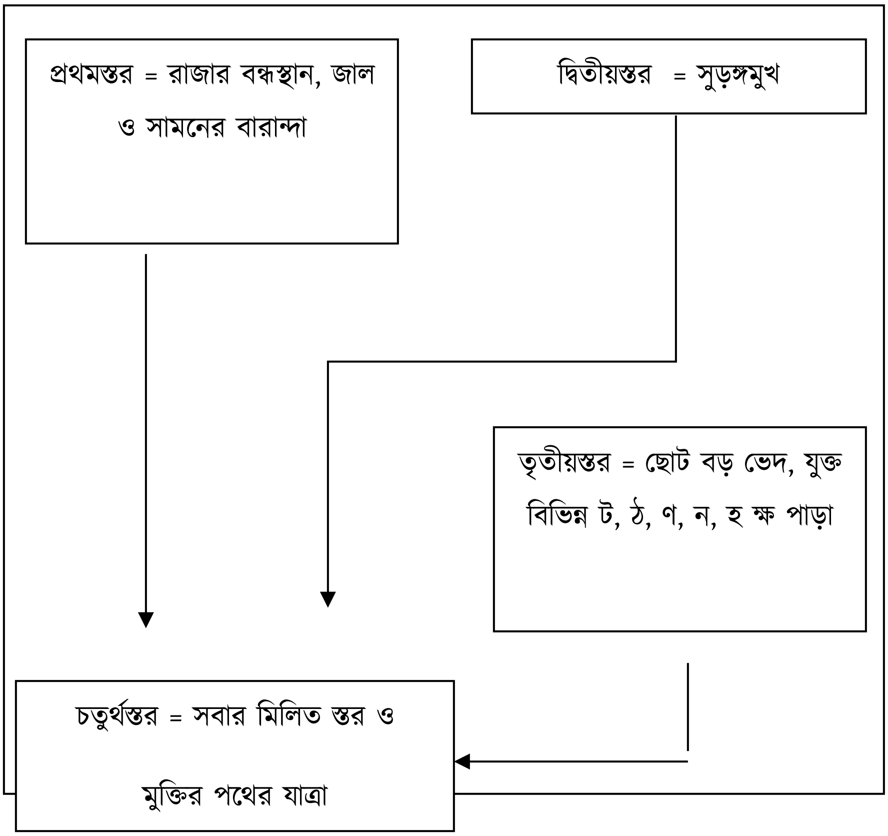
প্রথমস্তর = রাজার বন্ধস্থান, জাল ও সামনের বারান্দা
দ্বিতীয়স্তর = সুড়ঙ্গমুখ
তৃতীয়স্তর = ছোট বড় ভেদ, যুক্ত বিভিন্ন ট, ঠ, ণ, ন, হ ক্ষ পাড়া
চতুর্থস্তর = সবার মিলিত স্তর ও মুক্তির পথের যাত্রা

অর্থাৎ সবাই একই ভাবনায় মিশে, উদ্দীপ্ত হয়ে, চতুর্থস্বরে সাধারণীকৃত হয়ে মুক্তির দিকে গেছে। আর এই গঠনে বার বার দৃশ্যপটের পরিবর্তন নয়, স্থায়ী এই সজ্জা বিন্যাসের মধ্যে তা ধরা পড়ে। বহুরূপীর মঞ্চনির্দেশনায় এর প্রমাণ পাই। এবার আমরা রক্তকরবীর স্থান ও কালের মাত্রা প্রসঙ্গে কথামুখ খুলতে পারি। রক্তকরবী নাটকটি যক্ষপুরী নামক একটি নগরকে কেন্দ্র করে ঘটেছে। যক্ষপুরীর বিভিন্ন স্থানকে ধরা আছে এখানে। যথা :

১। প্রাসাদের জালের বারান্দার স্থান

২। সুড়ঙ্গের মুখস্থান

৩। ট, ঠ, ণ, ন, হ, ক্ষ-এর মতো বর্ণসংখ্যার নাম দ্বারা বিশেষায়িত স্থান।

৪। গড় ও প্রতাপগড়ের মতো নামবাচক স্থান ।

সমগ্র নাটকটির ঘটনা জানালার জালের বাইরের বারান্দায় সংগঠিত হয়ে সমস্ত স্থানকে প্রায় ছুঁয়ে গেছে। গেছে কেননা নাট্যক্রিয়া এই নামবাচক ও বর্ণসংখ্যান নাম দ্বারা বিশেষায়িত না করে একটি নির্বিশেষ স্থানের মাত্রাকে ধরা হয়েছে। সেখানে যক্ষপুরীর পৌরাণিক অনুষঙ্গ এনে, কর্ষণজীবী ও অকর্ষণ জীবির রামায়ণ কালের দ্বন্দ্বকে বর্তমান করে যন্ত্রসভ্যতা ও কৃষি সভ্যতার দ্বন্দ্ব, মুক্তি ও বদ্ধতার দ্বন্দ্বের কথাই মুখ্য হয়েছে। রাজা নিজের ঘরে বন্ধ। সুড়ঙ্গ ঘরের শ্রমিক যন্ত্রসভ্যতার দাস। তাদেরকে সেখানে নন্দিনী রঞ্জনের মুক্তির সুর প্রাণে সঞ্চারিত করে দিয়েছে। ধানী সবুজের গন্ধকে, রঙকে চারিয়ে দিয়েছে তাদের মধ্যে। চোখে তাদের পৌষের ডাক, নবান্নের স্বপ্ন চারিয়ে দিয়েছে। রাজা চার দেওয়ালের বদ্ধতার সাধনা থেকে, পাষাণপ্রাণ থেকে মুক্তি পেয়েছে। তাই সে যান্ত্রিক জটিলতা থেকে মুক্তি পেয়ে মরার নতুন অর্থ পেয়েছে। স্থান সংযুক্তি এভাবে নতুন মাত্রা যোগায় নাটকটিতে।

সমগ্র নাট্যক্রিয়াটি সংঘটিত হয়েছে ধ্বজাপূজার একটি দিনে এবং সকাল-দুপুর- বিকালের সন্ধ্যার কালমাত্রাকে ধরে নাটকের সমাপ্তি ঘটেছে।

নন্দিনী কিশোরের কথা দিয়ে শুরুর পরেই অধ্যাপককে নন্দিনী বলে আজ রঞ্জনের সাথে আমার দেখা হবে এবং শেষ পর্যন্ত রঞ্জনের সাথে আজই তার দেখা হয়। রাজা জাল ভেঙে বাইরে বেরিয়ে আসলে নন্দিনী দেখে রঞ্জন মৃত অবস্থায় পড়ে আছে। অর্থাৎ রঞ্জনের আগমন বার্তা, তার জন্য অপেক্ষায় নগর দ্বারে বসে থাকা, আসার সংবাদ এবং তার মৃত্যু—একই দিনে ঘটেছে। আর এই একটি দিনের ঘটনা সময়ের বিভিন্ন কাল পর্বকে ধরে রেখেছে।

নাটকটি শুরু হয়েছে ঠিক ভোর সকাল নয়, সকালের এমন একটি সময়ে। কেননা—শুরুতে নন্দিনী কিশোরকে বলে— 'যা, যা এখনই কাজে ফিরে যা, দেরি করিসনে'—এই 'এখনই কাজে ফিরে যা'-এর দ্বারা বোঝায় কিশোর কাজে গিয়েছিল সকালে এবং যাবার পর আবার ফিরে এসে নন্দিনীর সাথে কথা বলছে এবং নন্দিনী তাকে ফিরে যেতে বলছে (বহুরূপী যদিও শুরুর এই দৃশ্যকে ভোরের দৃশ্য হিসাবে উপস্থাপিত করেছিল— 'ওই ভোরে যে দৃশ্য, একেবারেই প্রথম, নন্দিনী বসে আছে, আর কিশোর দৌড়ে আসছে। ভোরের কারখানা ভো বাজবে। সাইরেন বাজবে) তবে এটি সকাল, দুপুর নয়। নয়

কেননা, চন্দ্রা ফাগুলালকে এর একটু পরেই বলে—'ও কি সকাল থেকেই মদ'। অর্থাৎ কিশোর সকালে গিয়ে কাজে আবার ফিরে এসেছিল। তেমনি আবার বিকালের চিত্রও আমরা দেখি নাটকে। নন্দিনী দেখে — প্রেতপুরীর দরজা খুলে গেছে।...ঐ যে বেরিয়ে আসছে' যারা তারা নন্দিনীর চেনা পাশের গাঁয়ের লোক । অর্থাৎ এটি কাজ শেষে ঘরে ফেরার সময়ের কথাই বলে।

সুতরাং এই কাজে যাওয়া এবং চলে আসার ঘটনা সকাল ও বিকেলের সময়- মাত্রাকে ধরে আছে। তাই মাঝের সময় পর্বটা চলেছে সকাল বিকেলের মাঝপর্বে, দুপুরে। বিকেল এগিয়ে আবার গোধূলির প্রসঙ্গও আছে অধ্যাপকের কথায় : ‘তোমার কপালের রক্তকরবীর গুচ্ছ আজ প্রলয় গোধূলির মেঘের মতো দেখাচ্ছে।' আবার নন্দিনী বলে—'দেখতে দেখতে সিঁদুরে মেঘে আজকের গোধূলি রাঙা হয়ে উঠল। ‘এই গোধূলি আবার সন্ধ্যায় পর্যবসিত হয়। এই সময়-মাত্রার প্রমাণ পাই আমরা সর্দারের কথায়। সে সন্ধ্যেবেলা নন্দিনীর কাছ থেকে কুঁদ ফুলের মালা নেবে বলেছিল। সেই সর্দার নন্দিনীকে বলে 'আমার ঘরে কুঁদফুলের মালা দেখে গোঁসাই এর প্রাণ চমকে উঠেছে'। অর্থাৎ সন্ধ্যার সময় নন্দিনীর কাছ থেকে মালা নিয়েছে এবং গোঁসাই তা দেখেছে। সুতরাং ঘটনা যেখানে শেষ হয়েছে—রাজার বের হয়ে আসা—তা সন্ধ্যাবেলাতেই ঘটেছে।

তবে এই সময়-মাত্রা একটি দিনের হলেও পিছিয়ে গেছে ৪-৫দিন আগে রঞ্জনের আসার সংবাদের কথা দিয়ে। তবে এই একদিনের সময়-মাত্রা হলেও তা আসলে আবহমান কালের সময়মাত্রার সূচক। অতীতের কর্ষণজীবী-অকর্ষণজীবী দ্বন্দ্বের সঙ্গে যুক্ত যন্ত্র-সভ্যতা ও কৃষিসভ্যতার দ্বন্দ্ব। বর্তমানকালের সমস্যা আত্মিক সংকট এবং তা থেকে মুক্তির উদ্দেশ্যে সবার যে যাত্রা – তা আগামী কালের সময়- মাত্রার দিকে যাত্রা। রক্তকরবীর একদিনের সময়-মাত্রা এই ভাবনাকেই ধরে আছে।

মধ্যযুগের জঙ্গনামাধর্মী সাহিত্য ও সাবিরিদ খানের রসুল বিজয়

আসাদুজজামান

গবেষক, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

আরবিতে যা মাগাজি, ফরাসিতে তাই জঙ্গ, সংস্কৃতে যুদ্ধ এবং বাংলায় লড়াই। ‘জঙ্গনামা’ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলমান জাতির ঐতিহ্যভিত্তিক, বীররসের কাব্য। ‘জঙ্গনামা’ ফরাসি ভাষার দুটি পৃথক শব্দ। ‘জঙ্গ’ শব্দের অর্থ যুদ্ধ এবং ‘নামা’ শব্দের অর্থ বিবরণ। অর্থাৎ যে পুস্তকে যুদ্ধের বিবরণ লিখিত হয়, তাকে জঙ্গনামা বলা হয়। তবে সব যুদ্ধকাব্যই জঙ্গনামা এমনটি নয়। বিশেষত হজরত মহম্মদ (স.) ও তাঁর স্বজনদের যুদ্ধই এই শ্রেণির মধ্যে

পড়ে। বর্তমানকালের যুদ্ধ কাব্যের সঙ্গে, যুদ্ধের সঙ্গে এই জাতীয় কাব্যেও যুদ্ধের তেমন মিল নেই। কেননা সময় বদলেছে, উন্নত হয়েছে যুগ, বদলে গেছে যুদ্ধের ধরণ। হজরত মহম্মদ (স.) স্বয়ং বত্রিশটা যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর জীবৎকালে বদরের যুদ্ধ, ওহুদের যুদ্ধ, খন্দকের ও খয়বরের যুদ্ধ ছিল ইসলাম তথা মুসলমানদের কাছে যুগান্তকারী ঘটনা। কাজেই সেইসব যুদ্ধবিবরণ, গাঁথার ও কাব্যের আকারে ইসলামের উন্মেষ যুগে জনপ্রিয় হয়েছিল। অগণিত মুসলমান সেখান থেকে পেয়েছে অফুরন্ত আনন্দ, স্বজাতীর গর্বে বাঁচার রসদ। ইসলামের বিজয় গৌরব হিসেবে সেই জঙ্গনামা সাহিত্যগুলি থেকে মুসলমান জনসমাজ শুনতে পেয়েছিল তাদের প্রাণের কথা। সেদিনের সেই জঙ্গ ছিল ইসলাম ধর্মের পক্ষে বিধর্মীদের বিপক্ষে। বর্তমানে আমরা যে সব যুদ্ধ দেখছি তা হল আগ্রাসন। নিজেদের ক্ষমতায়নের লড়াই। সেদিনের যুদ্ধও ছিল ক্ষমতায়নের জন্য কিন্তু এখনকার মত তার মধ্যে একেবারে মানবিকতা বর্জিত ছিল না। বর্তমান সমাজেও যুদ্ধ আছে কিন্তু সে যুদ্ধ ব্যক্তিক, পারিবারিক, সাম্প্রদায়িক, জাতিক, রাষ্ট্রিক জীবনের লড়াই। যুদ্ধই জীবনের জয় পরাজয় নির্ধারণ করে। এই লড়াই এর নাম প্রতিযোগিতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ধন, মান, যশ, ক্ষমতা, ভোগ, চিন্তা ও মতের লড়াই। নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার লড়াই, বাঁচার জন্য লড়াই। চলছে সর্বদা ও সর্বর্থা। জেতাই জীবনের লক্ষ্য। এই লক্ষ্যকে হাতিয়ার করেছিল মধ্যযুগের একদল মুসলমান কবি।

‘জঙ্গনামা’ সাহিত্যগুলি মূলত অনুবাদ সাহিত্য হিসেবে গড়ে উঠেছিল। বাঙালি কবিরা মূলত ফারসি ও উর্দু কাব্যগুলির অনুবাদ করে তাতে কিছুটা কল্পনা ও নিজস্ব ভাব মিশিয়ে এই ধরণের কাব্য রচনা করেছিল। স্বাভাবিক কারণেই এই জাতীয় কাব্য গুলিতে মধ্যপ্রাচ্যের প্রভাব অনিবার্য ভাবে চলে এসেছিল। জঙ্গনামাতে মধ্যপ্রাচ্যের প্রভাব যে পড়েছিল তা কাব্যপাঠ করলেই অনুধাবন করা যায়। কেননা প্রায় প্রতিটি জঙ্গনামা কাব্যের বিষয়, চরিত্র চিত্রন, বর্ণনা সব কিছুর মধ্যে আরবীয় সাহিত্যের ভাবধারা লক্ষ্য করা যায়। আরব্য রজনীর রূপকথার মত অনেক বিষয় জঙ্গনামা কাব্যে স্থান পেয়েছে। অলৌকিকতা, অতিপ্রাকৃত বিষয়ের ছড়াছড়ি জঙ্গনামায় যা মূলত আরবীয় সাহিত্য প্রভাবজাত।

ইসলামধর্ম ও মুসলমান জাতি উভয় মধ্যপ্রাচ্য থেকে আগত। হিন্দু প্রধান ভারতবর্ষে যখন মুসলমানরা প্রবেশ করল এবং পরবর্তীকালে শাসন ক্ষমতা দখল করল তখন থেকে এদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মহলে পরিবর্তন সূচীত হল। সেই পরিবর্তনের ঢেউ সাহিত্যেও আছড়ে পড়লো। সাহিত্যের গতিপথ পরিবর্তন হল। নতুন নতুন দিক উন্মোচিত হল। এমন-ই একটি সাহিত্যের নতুন দিক হল জঙ্গনামা সাহিত্য। মধ্যপ্রাচ্যের ভাবধারায় প্রভাবিত হয়ে এদেশিয় বাঙালি মুসলমান কবিরা তাদের কাব্যের নায়ক হিসেবে তুলে ধরলেন প্রাচ্য দেশের নায়ককে। বীর যোদ্ধার কৃতিকথা শোনাবার জন্য নায়ক চরিত্রকে করে তুলেছেন অলীক ক্ষমতাধর। ঈশ্বরের পরেই যার স্থান। বাস্তবের সঙ্গে যার মিল খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। তবুও যেখানে প্রতিযোগিতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা,

যেখানে যুদ্ধ সেখানেই মানুষের উৎসুক দৃষ্টি। তাই সেই সময়ে যুদ্ধকাব্যগুলি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। এই যুদ্ধকাব্যের নায়কের সংকট ও উত্তরণ এবং বিরুদ্ধ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই কাহিনি বাঙালি মুসলমান সমাজে একটা আলাদা স্থান করে নিয়েছিল। অথচ দুঃখের বিষয় বাংলা সাহিত্যের অধিকাংশ স্নাতকোত্তর পাশ ছাত্র-ছাত্রী জঙ্গনামা সাহিত্য সম্পর্কে অবগত নন। এদিকে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে জঙ্গনামা সাহিত্য ও কবির সংখ্যা নিতান্তই কম নয়। আবার তাঁদের কবি কৃতিও সামান্য নয়। এ যাবৎ আমরা জঙ্গনামা সাহিত্য সম্পর্কে বিস্তারিত জানার সুযোগ পাইনি। কেননা সাহিত্যের ইতিহাসকাররা ইসলামি সাহিত্যের এই শাখা সম্পর্কে বা ইসলামি সাহিত্য সম্পর্কে তেমন আলোচনা করেননি। কেও কেও সামান্য ছুঁয়ে গেছেন। আবার কেও কেও সজ্ঞানে, অজ্ঞানে এড়িয়ে গেছেন। একমাত্র ড. সুকুমার সেন অল্পবিস্তর আলোচনা করেছেন কিন্তু তাও অসম্পূর্ণ ও খাপছাড়া গোছের। ড. সুকুমার সেন কিংবা দীনেশ সেন ইসলামি সাহিত্যকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার করেননি। কোথাও যেন একটু পক্ষপাতিত্ব করেছেন। আমি আমার এই আলোচ্য প্রবন্ধে ইসলামি সাহিত্যের এক অন্যতম শাখা জঙ্গানামার সৃজনবিন্দুকে স্পর্শ করেছি মাত্র। মধ্যযুগের সমস্ত জঙ্গনামা সাহিত্য ও কবিদের সম্পর্কে আলোচনার উপযুক্ত মানুষ আমি নই। তাছাড়া আমার পক্ষে জঙ্গনামার সমস্ত পাঠ্যবইও সংগ্রহ করা হয়ে উঠেনি। আমার ক্ষুদ্রজ্ঞানের স্থান থেকে আমি কেবলমাত্র সাবিরিদ খানের জঙ্গনামা (রসুল বিজয়) নিয়েই আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। কিছুদিক অসম্পূর্ণ থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। দিন বদলে পরিপূর্ণতা আসে। অপেক্ষায় থাকবো এবং কিছু ত্রুটির সংশোধনের সৌভাগ্য লাভ করার সুযোগ পাবো এই সূত্রে।

‘জঙ্গনামা’ কাব্যে যুদ্ধ কথা প্রধান নয়। যুদ্ধ শেষে হিন্দু-মুসলমান উভয় ধর্মের মেলবন্ধন দেখানো হয়েছে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে সম্প্রীতির বার্তা বহন করেছে, যা বর্তমান সমাজ ও সাহিত্যে খুবই জরুরী ও প্রাসঙ্গিক। এই মধ্যযুগীয় জঙ্গনামা সাহিত্যগুলিকে বিশ্লেষণ করলে বেশ কিছু বৈশিষ্ট লক্ষ্য করি। সেগুলি হল—

ক। ‘জঙ্গনামা’ কাব্যগুলি যথার্থ ঐতিহাসিক কাব্য না হলেও ইতিহাস প্রধান ধর্মীয় আখ্যান কাব্য। অর্থাৎ এই কাব্যের কাহিনি যথার্থ ঐতিহাসিক নয় ঠিকই কিন্তু ইতিহাসের কাহিনিকেই কবি কল্পনার রং মিশিয়ে ইতিহাস প্রধান করেছেন।

খ। এই জাতীয় কাব্যে নিজ ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করতে অন্য ধর্মের ভাবধর্মকে ক্ষুন্ন করেছেন কবিরা, যা মোটেও সমিচীন নয়। কবিরা নিজধর্মকে অন্যধর্ম অপেক্ষা বড়ো করে দেখাতে গিয়ে বিভিন্ন ভাবে বিরোধীধর্মকে হেনস্থা করেছেন। কিন্তু কাব্য শেষে গিয়ে উভয় ধর্মকে এক সূত্রে পুনরায় বেঁধেছেন যা সত্যিই খুব প্রশংসার দাবি রাখে।

গ। জঙ্গনামাধর্মী সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপাদানের পাশাপাশি আরও অনেক অনৈতিহাসিক, অলৌকিক ও রূপকথা ভিত্তিক উপাদানের সংমিশ্রণ পরিলক্ষিত হয়।

ঘ। এই জাতীয় কাব্য মধ্যে কেন্দ্রীয় চরিত্রের উপর এতটাই বীরত্ব দেখানো হয়েছে, যা পুরোটাই অলৌকিক ও কাল্পনিক বলে মনে হয়। ইসলাম সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অভাববোধ এবং জীবনকথা রূপায়নে এদেশীয় আদর্শের প্রভাব থেকেই এই ধরণের রচনার সৃষ্টি।

ঙ। লোকমানসে চিরদিনই এমন কিছু ঘটনা সত্য বলে স্বীকৃত হয়ে আসছে যার কোন কার্যকারণ সম্পর্ক নেই। নবী, রসুল ও ওলী আউলিয়াদের জীবন ও ক্রীয়াকলাপের সঙ্গে এ ধরণের বিশ্বাস জড়িত। জঙ্গনামা কাব্যগুলিতে এ শ্রেণির ঘটনা যত্রতত্র লক্ষ্য করা যায়।

চ। জঙ্গনামাধর্মী কাব্যগুলি এক অর্থে বিজয়'কাব্যের অন্তর্ভুক্ত। বিজয়' শব্দের সাধারণ অর্থ প্রতিপক্ষের পরাভব ব্যতীত আর এক অর্থে প্রাধান্য বা শ্রেষ্ঠত্ব। আবার অনেকে প্রস্থান বা গমন অর্থেও ব্যবহার করে থাকেন। বাংলায় হিন্দুরা বিজয় কাব্যের মধ্যে দেব-দেবীর মাহাত্ম্য প্রচার করলেও মুসলমান কবিরা তা করেননি। হয়তো কোন দেব-দেবীর অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন না বলে কিংবা রসুল বা গাজির ন্যায় ধর্মীয় মহাপুরুষদিগকে দেব-দেবী হিন্দুদের কাছে অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন অবতার শ্রেণির মানুষ সাজিয়েছে নিজ ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবান করে তোলার ইচ্ছার বশেই হোক মুসলমান কবিরা বিজয় কাব্যগুলির মধ্য দিয়ে ইসলামের মাহাত্ম্য প্রচার করেছিলেন— একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

ছ। অলৌকিক ঘটনার মধ্যে কল্পনার আধিক্য ঘটলেও তা লোকমানসে অবিশ্বাস্য বলে বিবেচিত হয় না। কিন্তু রূপকথা যতই চিত্তাকর্ষক হোক না কেন তা কখনো লোকজীবনে সত্য ঘটনার মর্যাদা বা স্বীকৃতি পায় না। কাব্যে বর্ণিত রূপকথা ভিত্তিক কাহিনিগুলির সংযোজন ঘটে থাকে কেবলই পাঠক হৃদয়ে গল্পরস সঞ্চারণের উদ্দেশ্যে। জঙ্গনামা কাব্যে রূপকথা জাতীয় কিছু কিছু ঘটনার সংমিশ্রণ ঘটেছে মূলত এ কারণেই। এই রূপকথা ভিত্তিক অধিকাংশ বর্ণনা স্থান পেয়েছে যুদ্ধ বর্ণনা প্রসঙ্গে। মুসলিম বীর যোদ্ধাদের শৌর্যবীর্যের পরিচয় দেবার ক্ষেত্রে।

জ। জঙ্গনামা কাব্যে ঐতিহাসিক ঘটনার চেয়ে অনৈতিহাসিক, অলৌকিক ও রূপকথা ভিত্তিক ঘটনার প্রাধান্য অধিক একথা অনস্বীকার্য। তা সত্ত্বেও মুসলিম বিশ্বে এ জাতীয় কাব্যের সার্বজনীন আবেদনের কথা স্বীকার করতেই হয়।

ঝ। জঙ্গনামা কাব্যে যুদ্ধের কথা মুখ্য ঠিকই তবুও অনেক জায়গায় রোমান্টিকতার আবেশ দেখা যায়। বিশেষ করে সাবিরিদ খানের 'হানিফার দিগ্বিজয়' কাব্যে হানিফা ও কয়রাপরীর প্রেম কিংবা 'সোনাভান' কাব্যে সোনাভান ও হানিফার প্রেম কাব্যের মধ্যে রোমান্টিকতার বাতাবরণ সৃষ্টি করেছে।

ঞ। এটা সত্য যে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য ধর্মকেন্দ্রিক। মুসলিম আমলের আগে হিন্দু ও বৌদ্ধদের এবং মুসলিম আমলে হিন্দু, শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণব ধর্মীয় কোন্দলকে কেন্দ্র করে বাংলা সাহিত্য গড়ে ওঠে। মুসলমান আগমনের পর পীর ফকির ও আলিম উলমাদের ইসলাম প্রচারে নতুন করে যে চিন্তার মুক্তি বিঘোষিত হল, তাতে মুসলমানদের চেয়ে হিন্দুদের ধর্মীয় চেতনায় প্রকট হয়ে উঠল। এর ফলে মুসলমান কবিরা তাদের রচিত ধর্মীয় সাহিত্যে বিশেষ করে যুদ্ধ বিষয়ক কাব্যে মূল চরিত্রের উপর ঈশ্বরত্ব আরোপ করে অলৌকিক ক্রিয়াকর্মের দ্বারা অন্য ধর্মের মানুষকে নিজ ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করতে চেয়েছিল।

ট। 'জঙ্গনামাধর্মী' কাব্যগুলি মূলত বীরবসের কাব্য। তবে বীররসের মাঝে মাঝে করুণ রসের মিশ্রণও লক্ষ্য করা যায়। ফলে বীররস ও করুণরসের মিশ্রণে কাব্যগুলি উৎকৃষ্টতা লাভ করেছিল।

প্রত্যেকটি সাহিত্য রচনার একটি নির্দিষ্ট পটভূমি থাকে। জঙ্গনামা সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রেও এর ব্যাতিক্রম হয়নি। জঙ্গনামাধর্মী সাহিত্য রচনার পটভূমি নিয়ে একটু আলোচনা করা যেতে পারে। তুর্কি বিজয়ের অনেক আগে থেকেই উত্তর-পূর্ব ভারত, চট্টগ্রাম, সিলেট প্রভৃতি স্থানে বানিজ্যিক আদান-প্রদান শুরু হয়। ১২০২-১২০৩ খ্রিস্টাব্দে সময়মতো সুযোগ বুঝে বখতিয়ার খলজি বাংলা আক্রমণ করেন এবং বাংলার প্রশাসনিক ক্ষমতা দখল করেন। এই সময়পর্বের ইতিহাস দেখলে আমরা দেখতে পাবো একদিকে ব্রাহ্মণ্য সমাজের জাতিভেদ প্রথার অন্তরালে জর্জরিত নিম্নশ্রেণির মানুষ মুক্তির জন্য প্রয়াসি অন্যদিকে ইসলাম ধর্মের নীতি আদর্শের পাশাপাশি মুসলমান শাসকের ভয়ে অত্যাচারিত নিম্নশ্রেণির হিন্দুরা দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে থাকে। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সংকীর্ণতা, অহমিকা এবং দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা নেতিবাচক ভাবনার কারণে তথাকথিত অন্ত্যজ শ্রেণি আত্মরক্ষা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠার লাভের উদ্দেশ্যে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছিল। এই ধর্মান্তরিত নব্য মুসলমানদের মধ্যে হিন্দুর মূর্তি নির্ভর দেববাদ ও আচার আচরণের যে সূক্ষ্ম প্রভাব তখনো পর্যন্ত টিকে ছিল, তা বিনাশ করতে না পারলে ইসলামের সর্বাত্মক বিজয় সম্ভব নয়—এটা মুসলমান কবিরা বুঝেছিলেন। এই জন্য দেখা যায় বিশেষ একটা সময় পর ইসলাম ধর্মের প্রতিষ্ঠতা হজরত মহম্মদ (স.) এর পবিত্র জীবনের কথা সকলকে জানানোর উদ্দেশ্যে লেখা হচ্ছে বিভিন্ন ধর্মীয় কাব্য ও বিজয়কাব্য। নবীবংশ ও জঙ্গনামার মত অসংখ্য কাব্য।

মুসলমান কবিরা তাঁদের প্রয়োজনবোধ থেকেই এই জাতীয় গ্রন্থ লেখালেখি শুরু করেন। যেহেতু সদ্য ধর্মান্তরিত মুসলমানদের মধ্যে ইসলাম ধর্মের কোন জ্ঞানই ছিল না। তারা ইসলামধর্মের ধর্মীয় গুরু কিংবা আল্লাহ ও রসুল

সম্পর্কে কোন কিছুই জানতো না। সেহেতু মুসলমান কবিরা ইসলামধর্মের গৌরব, ঐতিহ্য ও শৌর্যবীর্যের কথা শুনিয়ে তাদেরকে নিজধর্মের প্রতি ভক্তি, শ্রদ্ধা জাগাতে চেয়েছিল।

এরই পাশাপাশি একটা প্রেরণা কাজ করেছিল। হিন্দুধর্মের রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, হরিবংশ প্রভৃতি কাব্যের অনুবাদ হয় এবং সেই অনূদিত কাব্য বাঙালি পাঠক আগ্রহ ভরে গ্রহণ করেছিল। বাঙালি হিন্দুর ক্রমবর্ধমান প্রভাব ইসলামধর্মী লেখকেরা বেশিদিন এড়িয়ে চলতে পারলেন না। তারাও হিন্দু কবিদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে তাদেরই পথ অনুসরণ করলেন। ইসলামধর্মের বীর যোদ্ধাদের জীবনকথা নিয়ে জীবনী কাব্য এবং বিজয়কাব্য জাতীয় রচনা লেখালেখি শুরু করলেন। এ প্রসঙ্গে ড. সুকুমার সেন তাঁর ‘ইসলামি বাংলা সাহিত্য’ গ্রন্থে বলেছেন—

“বাঙালী হিন্দুর পুরাণ-পাঁচালীর ক্রমবর্ধমান প্রভাব ইসলামি পদ্ধতির লেখকেরা বেশিদিন এড়িয়ে চলতে পারলেন না। তারা ইসলাম ধর্ম ও প্রচারকদের জীবন, চরিত্র ও কাব্যের দমন কাহিনী ঢালাই করলেন ‘হরিবংশ’ ও ‘পান্ডববিজয়’ এর ছাঁচে! এই রচনাগুলি দুই শ্রেণির। এক শ্রেণীতে পড়ে পয়গম্বরদের কাহিনী। দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে জঙ্গনামা (অর্থাৎ যুদ্ধকাব্য)।”

সাবিরিদ খান মধ্যযুগের ইসলামি সাহিত্যের একজন বিশিষ্ট কবি। তিনি বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য সেগুলি আমাদের অগোচরে থেকে গেছে। তাঁর কবি প্রতিভা ও রচনা সম্পর্কে অনেক পাঠক আজও অজ্ঞাত। সাবিরিদ খান একটি নামসার ছায়ামূর্তি হয়ে থেকে গেছে। তাকে স্বরূপে জানা বোঝার কোন সুযোগই আমাদের হয়নি। বিস্তৃত কালের গর্ভ থেকে তাঁর নামটি এবং কালের কবল থেকে তাঁর রচনাগুলো উদ্ধার করেছিলেন সাহিত্য বিশারদ আব্দুল করিম। দুর্ভাগ্য আমাদের তাঁর তিনখানি কাব্যের কোন টাই পুরো পাওয়া যায়নি। তবুও আমরা এই খণ্ড কাব্যের মধ্যেই অখণ্ডের আভাস নেবার চেষ্টা করবো। সাবিরিদ খানের ‘বিদ্যাসুন্দর’ এবং ‘রসুলবিজয়’ কাব্যের আদ্যান্ত খণ্ডিত। আর ‘হানিফার দিগ্বিজয়’ কেবল অন্তে খণ্ডিত।

মধ্যযুগের অধিকাংশ কাব্যের শুরুতেই বিশেষ করে বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যের শুরুতেই যেমন দেব-দেবীর বন্দনা অংশ থাকে, তেমনি মুসলমান কবিরাও তাদের অধিকাংশ রচনার আগে আল্লাহ ও আল্লাহর রসুলের বন্দনা করে কাব্যের সূচনা করেছেন। যেহেতু সাবিরিদ খানের ‘রসুলবিজয়’ কাব্যের পুরোটা এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি, আদ্যান্ত খণ্ডিত। সেহেতু একথা নিশ্চিত করে বলা যাবেনা যে ‘রসুলবিজয়’ কাব্যের শুরুতে আল্লাহ বা রসুলের বন্দনা করা হয়নি। আমরা অনুমান করে নিতে পারি কাব্যের শুরুতে কবি আল্লাহ বা রসুলের বন্দনা করেছিলেন। আমরা রসুলবিজয় কাব্যের যতটুকু অংশ পেয়েছি সেই বর্ণিত অংশের সংক্ষিপ্ত কাহিনিটি এইরকম-

জয়কুম রাজার কনিষ্ঠপুত্র সালার সিপাহশালার দ্বিতীয় যুদ্ধে আলীর হাতে পরাজীত ও বন্দী হয়। এত বড়ো বীর শত্রুর পরাজয়ে আনন্দিত রসুল আলীকে এই কৃতিত্বের জন্য অভিনন্দিত করলেন অন্যদিকে জয়কুম রাজার শিবিরে তখন শোকের ছায়া নেমেছে। জয়কুম রাজার তার পুত্রের বীরত্বের কথা স্মরণ করে মনে মনে দুঃখ বোধ করেন। বীর পুত্রের বন্দীদশার কথা ভেবে মহারাজ বিষাদে বিকল হয়ে পড়েন। পিতার এমন দশা দেখে জয়কুম রাজার বাকি তিন পুত্র তাকে সান্ত্বনা দিলেন এবং সালারের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাকে উদ্ধারের জন্য যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে লাগলেন। কিন্তু যুদ্ধে সেও পরাজিত ও বন্দী হয়। এবার জয়কুমের সেজোপুত্র খাখানের চতুর্থ যুদ্ধে মহম্মদ হানিফার সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত হয়। খাখানের এই যুদ্ধের বিবরণ দেখলে মহাভারতের যুদ্ধের কথা স্মরণে চলে আসে। খাখানের এই যুদ্ধ এগারো দিন ধরে চলেছিল। এই যুদ্ধে আলীর, অষ্টাদশ সন্তান আবু বকর হজরত ওমর, হজরত উসমান, মাবিয়া, হানিফা, হাসাম-হোসেন, আবদুল্লা ছাড়াও ছায়াদ, ওক্কাম, খবাইল প্রমুখ বীর এযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। দু'পক্ষের তুমুল সংগ্রামের মধ্যে খাখানকে যুদ্ধে পরাজিত করে মুসলমান হতে বলেন বীর খবাইল। কিন্তু খাখান দীর্ঘ দশদিন যুদ্ধ করার পরেও পরাজয় স্বীকার করেনি। খানিক বিশ্রাম নিয়ে পুনরায় যুদ্ধ করতে নেমেছেন। কিন্তু আলীকে বধ করতে পারেননি। যুদ্ধের বিরতি চেয়ে খাখান তার বাড়ি ফিরে এসে পুনরায় পিতার আশির্বাদ নিয়ে সংগ্রামের পথে রওনা হলেন। এবং মনে মনে ভাবিলেন--

"প্রথমে মারিব আলী মুছিব মনের কালি

রসুল মারিব অবশেষে।

এই মনোবাঞ্ছা নিয়ে খাখান ও আলীর মধ্যে চতুর্থ বারের জন্য যুদ্ধ বাধিল। শুরু হল দুই বীরের মধ্যে মহারণ। একদিকে হজরত আলীর কাছে রসুলের হুকুম আছে খাখানকে জীবিত বন্দী করে তার সামনে হাজির করা। তাই আলী তাকে বধ করতে পারছে না। ইচ্ছে করলে আলী যখন তখন তাকে সংহার করতে পারে। তবে হজরত আলী যুদ্ধ করতে করতে উপলব্ধি করেছেন তিনি অনেক বীরের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন কিন্তু খাখানের মতো বীর যোদ্ধা দেখেননি। এদিক থেকে খাখান একজন আদর্শ বীর যোদ্ধার ভূমিকা পালন করেছে। এইভাবে একদিন, দুদিন করে একটানা কুড়িদিন ধরে যুদ্ধ চললো। কিন্তু কোন ফলাফল আসল না। খাখান পুনরায় যুদ্ধ বিরতি নিয়ে বাড়ি ফিরলেন। আবার সাতদিন ধরে যুদ্ধ চলল কিন্তু কেও কাউকে পরাজিত করতে পারলেন না। তখন খাখান আলীকে এক শর্ত দিল যে কোমর ধরে উঠাতে পারবে সেই যুদ্ধে জয়লভ করবে। শর্তসাপেক্ষে প্রথমে খাখান আলীকে তুলতে গিয়ে ব্যর্থ হয় কিন্তু আলী খাখানকে কাঁধে তুলে রসুলের নিকট নিয়ে গেলেন। তখন অনন্যোপায় জয়কুম রাজা মন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী গোপনে রণক্ষেত্রে অসংখ্য কূপ তৈরী করলেন এবং সেগুলিকে সুকৌশলে ঢেকে রাখলেন। পরদিন সকালে আলী যুদ্ধ করতে এসে সেই কূপে পড়লেন। এবারের যুদ্ধে সৈন্যপত্য ছিল

জয়কুম রাজার জ্যেষ্ঠ সন্তান কওয়াসের। আলীর এই বিপদের সময় স্বয়ং রসুল আল্লাহকে স্মরণ করে জিকির করতে করতে যুদ্ধের ময়দানে প্রবেশ করেন।

রসুলের যুদ্ধের কারাক্রম দেখে কওয়াসের পালাতে চাইলে রসুল তাকে ধরে বলেন এক আল্লাকে যদি মান আর আমাকে আল্লার রসুল বলে গ্রহন কর তবেই তুমি মুক্তি পাবে না হলে তার মুন্ড কেটে ফেলা হবে। রসুলের কথা মতো কওয়াসের মুসলমান ধর্ম গ্রহন করে এবং তার পিতাকে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করার জন্য অনুরোধ করেন কিন্তু পিতা জয়কুম কোন মতেই ইসলাম কবুল করতে চান না। তিনি একজন বীর আকুতোভয়, নির্ভীক, দৃঢ়চেতা মনের পরিচয় দেন। কিন্তু রাজা অবশেষে বাকি তিন পুত্রের কথা ভেবে মুসলমান হতে বাধ্য হলেন। রসুল তার কথামত রাজার চার পুত্রকে বন্দীদশা থেকে মুক্তি দেন। নিজের সেনাপতি খবাইলের সঙ্গে জয়কুম রাজার মেয়ের বিবাহ দেন। কাব্যের শেষে এইভাবে বিবাহের মধ্য দিয়ে উভয় ধর্মের মেলবন্ধন দেখানো হয়েছে। এই বিবাহকে কেন্দ্র করে সেকালের সমাজ, সংস্কৃতি ও লোকাচারের যে চিত্র আমরা পাই তা তৎকালিন মুসলমান সমাজের সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে। তবে আমরা মুসলমান সমাজের সার্বিক রূপায়ন দেখতে পাই না। মধ্যযুগের ইসলামি সাহিত্যের এটি একটা বড় দুর্বলতার দিক। কোন মুসলমান কবি সাহিত্যিকই এই দুর্বলতাকে কাটিয়ে উঠতে পারেনি। অনেকে এর পেছনে হাজারো যুক্তি দিতে পারেন। কিন্তু সে সব মিথ্যা জালের বুনানে তৈরী। হাজারো যুক্তি দিয়েও মুসলমান কবিদের এই দুর্বলতাকে আড়াল করা যাবে না। তবে একটা কথা বলা যেতে পারে সমকালের সব পরিবেশ, ঘটনা, আচার, আচরণ সব মানুষের মনে ছায়াপাত করে না। ব্যক্তি মানুষের রুচি, প্রবনতা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী বিশেষ স্থান, কাল, ধর্ম, আচার প্রতি আগ্রহী হয়।

তাই কোন একজন কবির লেখায় মুসলমান সমাজের সার্বিক রূপ আমরা দেখতে পাই না। কেও শুধুমাত্র ধর্মের কথা, কেও রাজদরবারের কথা, কেওবা যুদ্ধ বর্ণনার মধ্য দিয়ে রাজ্যজয়ের কথাই বর্ণনা করেছেন। দেশ-কাল-গত সমষ্ঠি তথা সামাজিক জীবনধারার পূর্ণাঙ্গ চিত্র কেউই দেন নি। তাছাড়া কোন একক মানুষের চিন্তা ও ভাবধারার মধ্য দিয়ে জীবনের সর্বোতমুখী চেতনাকে তুলে ধরা যায় না। মনের প্রবনতা অনুযায়ী তুচ্ছ ঘটনা কারো কাছে গুরুতর হয়ে ওঠে আবার গুরুতর বিষয় তুচ্ছ, অবহেলিত হয়। তবে আমরা এই জঙ্গনামা সাহিত্যের প্রাসঙ্গিকতা ও গুরুত্বকে কোনভাবেই অস্বীকার করতে পারি না। কেননা এই জঙ্গনামা সাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই সাম্প্রদায়িক সংঘাত ভুলে সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন। একজন হিন্দু নারীর বিবাহ হচ্ছে মুসলমান যুবকের সঙ্গে অথচ কপালে সিঁদুর বিদ্যমান। এর থেকে প্রমানিত হয় একই দেহে হিন্দু ও মুসলমান দুই সত্ত্বা বিরাজ করছে। এখানে ধর্ম নয়, মানুষকেই বড়ো করে দেখানো হয়েছে। ধর্ম ও রাজনীতির উর্ধ্বে মানুষ ও মানবতার জয় ঘোষনা করা হয়েছে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এহেন মধুর মেলবন্ধন মধ্যযুগেই নয় বর্তমান কালে

একুশ শতকেও প্রাসঙ্গিক। বিবাহকে কেন্দ্র করে হিন্দু ও মুসলমান সমাজের রীতিনীতির কথা আমরা জানতে পারি।

কাব্যকাহিনি অনুসারে বোঝা যায় প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপির শেষাংশে কাব্য সমাপ্ত প্রায়। অতএব কাব্যটি ক্ষুদ্র। ইরাক রাজ জয়কুমের সঙ্গে হজরত মহম্মদের যুদ্ধ বৃত্তান্তই কাব্যের মূল বিষয়। ইসলাম প্রচারের প্রেরনাই এ যুদ্ধের কারণ। তবে এই বিষয়ে আরও অনেক কবি কাব্য রচনা করেছেন। এ যাবৎ জৈনুদ্দিন-এর 'রসুলবিজয়', আকিল মুহম্মদের 'জয়কুম রাজার লড়াই', সোলেমান ও সৈয়দ সুলতানের 'জয়কুম রাজার লড়াই' ফয়জুল্লার 'জঙ্গনামা', সাবিরিদ খানের 'সোনাভান' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। উর্দুতেও 'জয়কুম রাজার লড়াই' সম্বন্ধে একাধিক রচনা রয়েছে। এ কাহিনি যে কাল্পনিক তা না বললেও চলে। কিন্তু রাজা জয়কুম ছিলেন ঐতিহাসিক ব্যক্তি এছাড়া হজরত আলী সহ বাকি সব চরিত্রগুলি ঐতিহাসিক। তবে যুদ্ধের বিবরণ কতটা সত্য সে বিষয়ে সন্দেহ থেকে যায়।

ফার্সি কাব্যের কাহিনি গ্রহন করে তিনি নিজের মত করে কাব্য-কাহিনি সাজিয়েছেন। বাঙালী কবি হয়েও কাব্যে বাঙালীয়ানাকে নিঁখুতভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারেন নি। সাবিরিদ খানের মূল লক্ষ্য ছিল যে রসুলের বিজয় গৌরব ও মাহাত্ম্যকে বাঙালী মুসলমান সমাজে জনপ্রিয়তার শিখরে পৌছে দেওয়া সেইমত তিনি কাব্যের কাহিনি নির্মাণ করেছেন। তবে কাব্যের কাহিনির পরিপূর্ণতা দেখাতে পারেন নি। কাহিনি নির্মাণে কার্য কারণ কোন সম্পর্ক নেই। কাহিনির অগ্রগতির পেছনে একটিই কারণ ইসলামের বিজয়। চরিত্র চিত্রনেও বিশেষ নজর দেন নি। ঐতিহাসিক সব চরিত্রগুলিকে কল্পনার জালে করে তুলেছেন অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী। একটা চরিত্রে পূর্ণতা আসে তখনই যখন চরিত্রের মধ্যে ঘাত-প্রতিঘাত, উত্থান পতন আসে। এবং চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব চরিত্রের বিকাশে সহায়ক হয়। কিন্তু এই কাব্যের কোন চরিত্রেই এই বৈশিষ্ট্য গুলি লক্ষিত হয় না। রসুল চরিত্রটি এই কাব্যে মানবিক হয়ে উঠতে পারতো, কিন্তু রসুল চরিত্রে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আরোপ করেছেন, যাতে রসুল চরিত্রটিকে দেখে মনে হয় কাল্পনিক কোন চরিত্র। রসুল চরিত্রের বিপরীতে কবি যে চরিত্র গুলি নির্মাণ করেছেন তার অধিকাংশ চরিত্রই কাব্যের প্রয়োজনে সৃষ্টি করা। কোন চরিত্রের মধ্যে দম নেই। জয়কুম রাজার চরিত্রে কিছুটা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। শক্তিশালী, বীর, নির্ভীক, দৃঢ়চেতা হওয়া সত্ত্বেও চার পুত্রের বন্দী এবং পুত্রশোকে ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন।

কাব্যের ভাষা প্রয়োগে কবি পাণ্ডিত্য দেখিয়েছেন। ষোল শতকের এক বাঙালী কবির যুগ দুর্লভ শব্দ চেতনা ও অন্যান্য সৌন্দর্যে কাব্যিক কথা নির্মাণের এই সযত্ন প্রয়াস, আটপৌড়ে ভাষাকে নতুন অবয়ব দান, বিরল শব্দের বহুল প্রয়োগ, বিদেশি শব্দের প্রয়োগ, কাব্যের লাবন্য বৃদ্ধি করেছে-যা আমাদের বিস্মিত করে। 'রসুল বিজয়' কাব্যের পান্ডুলিপি প্রাচীনতর বলেই হোক, অথবা অধিকতর জনপ্রিয় হয়নি বলেই হোক—এই কাব্যে যে

ব্যাকরণগত ও ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই—তা ষোড়শ শতাব্দির শেষদিকে বা সপ্তদশ শতাব্দীর গ্রন্থে দেখা যায় না।

জঙ্গনামা কাব্যগুলিতে রসুল, আলী, হামজা ও হানিফার অস্ত্রধারণ ও রাজ্যজয় অভিন্ন লক্ষ্যে নিয়ন্ত্রিত। ধন নয়, মান নয়, রাজশক্তিকে প্রভাবিত করে দেশে দেশে ইসলাম প্রচারই তাদের একমাত্র লক্ষ্য বলে বর্ণিত। তাই তাদের একহাতে তরবারি অপর হাতে কোরাণ। ইসলামের গৌরব-গর্বী আল্লাহর সেবক এই বীরদের শক্তি ও সাহস যুগিয়েছে স্বধর্ম-প্রীতি। বিশ্বাস ও নিষ্ঠাই তাদের সম্বল। ইসলামের প্রসারকল্পে তাদের দেহ, মন, আত্মা সমর্পিত। তাঁরা মনে করেন তাঁদের উদ্দেশ্য মহৎ। তাই বল প্রয়োগ করে ধর্মের জয় অধর্মের পরাজয় ঘটনা দোষের নয়। তারা যখন কাফের দের বলে—

“কালেমা পড়িয়া হও মুসলমান।

মুর্তি ভাঙিয়া কর মসজিদ নির্মাণ।।”

তখন তাতে কোন অন্যায় আছে বলে মনে করেন নি। ড. আহম্মদ শরীফ মনে করেন—

“উৎসাহের আধিক্যবশে আমাদের কবিরা ইসলামের উন্মেষ যুগের বীরদের এভাবে চিত্রিত করে আমাদের করেছেন লজ্জিত, তাঁদের করেছেন কলঙ্কিত আর ইসলামকে করেছেন অবজ্ঞেয়।”

একথা সত্য যে মহৎ জীবন ও আদর্শকে রূপ দিতে গেলে মহাপ্রাণ মনীষী কবির প্রয়োজন। মধ্যযুগে মুসলিম কবিদের সাধ ছিল অনেক কিন্তু সাধ্য ছিল সামান্য তাই মহৎ জীবন ও আদর্শকে রূপ দিতে গিয়ে বিকৃত করে ফেলেছেন। কবিরা স্বধর্মের প্রতি মোহকে কাটিয়ে উঠতে পারেনি। নিজ ধর্মের গন্ডির বাইরে গিয়ে মনুষ্যত্বের জয়গানও করতে পারেনি। তাই তাদের রচিত কাব্যগুলি সর্বজনীনতা পায়নি। সার্বজনীন হয়নি ঠিকই কিন্তু এই কাব্যগুলি জনমানসে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। জঙ্গনামা সাহিত্যগুলিতে যুদ্ধবিগ্রহের ঘটনায় সব অদ্ভুদ ও উদ্ভট ঘটনার সন্নিবেশ করেছেন। ফলে এই সকল কাহিনিগুলি স্বভাবতই বাস্তবতা বর্জিত ও জীবন সত্য ও আদর্শ থেকে ছিটকে গিয়েছে। তবে মুসলমানি বাংলায় রচিত জঙ্গনামা কাব্যগুলির মধ্যে এই সকল অলৌকিক ও অস্বাভাবিক কাহিনি সংস্থাপনের মূলে কারণ ছিল। এদেশে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ধীরে ধীরে দেশের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের পরিবর্তন ঘটে। এবং বাঙালী হিন্দু-মুসলমানদের জীবনে এক অনিশ্চিত পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল। তা সত্ত্বেও জনসাধারণের রসপিপাসা একেবারে নির্মূল হয়নি। জাতীয় জীবনের নানা দৈন্য, অধঃপতন মানবিক মূল্যবোধের সংকট যখন অত্যন্ত প্রকটিত হয়ে উঠেছিল তখন তা ধামা চাপা দেওয়ার

জন্য কাব্য রচয়িতাগণ বাস্তবতা বর্জিত কল্পনা নির্ভর কাহিনির আমদানি করেছিলেন। এই কল্পনা নির্ভর কাহিনিগুলির তখনকার দিনে জনমানসে রসদ জুগিয়েছিল।

সহায়ক গ্রন্থাবলী

আকর গ্রন্থ:

১. ‘রসুল বিজয়’ – সবিরিদ খানের গ্রন্থাবলী, আহমেদ শরীফ (সম্পাদনা), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, বাংলাদেশ।

২. ‘শাহ গরীবুল্লাহ ও জঙ্গনামা’ – মুহম্মদ আব্দুল জলিল (সম্পাদনা), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, বাংলাদেশ।

সহায়ক গ্রন্থ:

১. আবুল আসহান চৌধুরী (সম্পাদনা) – মধ্যযুগের কবি ও কাব্য, গ্রন্থ-ভূমিকা, আহমদ শরীফ, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, ফেরুয়ারী, ২০১৭, শোভা প্রকাশ, ঢাকা, বাংলাদেশ।

২. আজহার ইসলাম – বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস – প্রাচীন ও মধ্যযুগ – তৃতীয় সংস্করণ, জুলাই, ২০১০, অনন্যা, ঢাকা, বাংলাদেশ।

৩. আহমদ শরীফ – বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড), প্রথম প্রকাশ, ২০১১, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা।

৪. আহমদ শরীফ – মধ্যযুগের কাব্য সংগ্রহ, প্রথম সংস্করণ, পৌষ ১৩৬৯, সময় প্রকাশ, ঢাকা, বাংলাদেশ।

৫. ওসমান গনী – ইসলামী বাংলা সাহিত্য ও বাংলা পুঁথি, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৯, রত্নাবলী, কলকাতা।

৬. মহম্মদ এনামুল হক – মুসলিম বাংলা সাহিত্য, চতুর্থ মুদ্রণ, মে, ২০১৩, মওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, বাংলাদেশ।

৭. মহম্মদ শহীদুল্লাহ – বাংলা সাহিত্যের কথা – দ্বিতীয় খণ্ড, চতুর্থ মুদ্রণ, সেপ্টেম্বর ২০১৪, মওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, বাংলাদেশ।

৮. সুকুমার সেন – ইসলামী বাংলা সাহিত্য-পঞ্চম মুদ্রণ, জুন ২০১৬, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।

৯. সাইফুল্লা এবং সুকান্ত মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত) – এবং সংস্কৃতি, প্রাগ-আধুনিক বাংলা সাহিত্য : মুসলিম কবি ও কাব্য – প্রথম মুদ্রণ, ডিসেম্বর ২০১৭, বর্ণায়ন, কলকাতা।

১০.	ক্ষেত্রগুপ্ত – বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস, একাদশ সংস্করণ, জুলাই, ২০০৬, গ্রন্থনিলয়, কলকাতা।

পত্র পত্রিকা:

১১.	সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা (ত্রৈমাসিক), চতুর্বিংশ ভাগ, প্রকাশ ১৩২৪, আবদুল গফুর সিদ্দিকী, বিষয় – ‘জঙ্গনামা’।

রূপকথা ও ছোটোদের স্বপ্ন : একটি তাত্ত্বিক আলোচনা

অন্তরা দত্ত

গবেষক, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

রূপকথা এক অর্থে আমাদের স্বপ্নপূরণের কাহিনি। যেসব নেতিবাচকতা বা প্রতিকূলতা রূপকথার পাতায় লিপিবদ্ধ হয়ে আছে, তা আমাদেরই জীবনচর্যার এক-একটি ছবি। বাস্তবে তো এসবের হাত থেকে আমরা রেহাই চেয়েও পাই না। তাই আশ্রয় নিতে হয় কল্পনার। রূপকথার পরিণতিতে যে মুশকিল আসান ঘটে, তা আসলে মানুষের ইচ্ছারই প্রতিফলন। মানুষ বিশ্বাস করতে চায়, যদি সে সৎভাবে জীবনযাপন করে, তাহলে poetic justice লাভ হবেই; কিন্তু বাস্তবে তা ঘটে না। মানুষ সেই আশা পূরণ করে রূপকথার মধ্য দিয়ে। বাস্তবের নেতিবাচকতাকে কল্পনার ইতিবাচকতায় রূপান্তরিত করার আর এক নাম রূপকথা। একালের রূপকথাকার রতনতনু ঘাটী যথার্থই বলেছেন, “আমরা যে দেশের স্বপ্ন দেখি, যে দেশে পৌঁছতে পারলে আর কিছু চাই না, রূপকথা সেই দেশের স্বপ্ন দেখায়। তাই রূপকথা পড়তে পড়তে আমরা সেই স্বপ্নের দেশে পৌঁছে যাই।” [১] কিন্তু জাগ্রত অবস্থায় মনের মধ্যে লালিত আশা-আকাঙ্ক্ষা নিদ্রিত অবস্থাতেও পূরণ হয়ে থাকে অনেক সময়ে। বাস্তবের অভীষ্ট মিলে যায় স্বপ্নে। যদি মনের কোণে অবদমিত, সুপ্ত, লুক্কায়িত থেকে যায় কোনও বাসনা; তাও পূরণ হয়ে থাকে স্বপ্নে। সেইসব স্বপ্নের নানান চিত্র রূপকথার মায়াবী বর্ণে-তুলিতে অঙ্কিত হয়েছে কোনও কোনও গল্পে। এই লেখার শুরুতেই আমরা এমনই কয়েকটি রূপকথা কাহিনির অবতারণা করব।

গল্প ১

বিশাল মাঠের ধারে বন, বনের কিনারায় বহুকালের পুরনো এক রাজপুরী। তারই ধারে গরু চরাতে যায় এক রাখাল। গরুগুলো মাঠে ছেড়ে দিয়ে গাছের ছায়ায় বসে রাখাল, আর একদৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখতে থাকে ভগ্ন রাজপুরীকে। “এক একদিন সেই ভাঙা রাজপুরীটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার মন কেমন করে ওঠে।

” [২] একদিন এমনই ভাবতে ভাবতে তার চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসে। এরপর সে দেখতে পায়- নানা রঙের পাথরে গড়া প্রকাণ্ড এক রাজপুরী। গায়ে রাজার পোশাক, মাথায় মুকুট, কোমরে লম্বা তলোয়ার গুঁজে রাখাল নিজে রাজপুরীর সামনে দাঁড়িয়ে আছে আর সকলে ‘মহারাজ’ বলে তাকে নমস্কার করছে। সভায় উপস্থিত এক ব্রাহ্মণের মুখে সিন্ধুরাজার মেয়ের অপূর্ব রূপ-গুণের কথা শুনে সিন্ধুরাজ্য ধূলিসাৎ করে রাজকন্যাকে রাজপুরীতে নিয়ে আসার প্রতিজ্ঞা করে রাজামশাই। সিন্ধুরাজ্যে গিয়ে পৌঁছালে রাজকন্যা তাকে বিনা যুদ্ধে সাদরে বরণ করে নেয় ও পক্ষিরাজে চড়ে রওনা দেয়। কিন্তু অবিশ্বাস্যভাবে রাজা রূপী রাখাল আর তার নাগাল পায় না। বরং কানে এক হ্যাঁচকা টান অনুভব করে। চোখ চেয়ে দেখে, ‘সম্মুখে লকড়ি হাতে তাঁর বাবা দাঁড়িয়ে!’ মহারাজ কানে হাত বুলোতে বুলোতে গরুগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে ঘরের দিকে রওনা দেয়। [‘মহারাজের দুর্গতি’ – খগেন্দ্রনাথ মিত্র]

গল্প ২

কুসুমবাটী গ্রামের তনু রায়ের কন্যা কঙ্কাবতী অপরূপ সুন্দরী। তার বিবাহ হবার কথা ছিল গ্রামের গরিব ও শিক্ষিত ছেলে খেতুর সঙ্গে। কিন্তু তনু রায় মেয়ে দান করে পণ নেন; সেই পণ দিতে না পারার কারণে খেতুর সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব নাকচ করে দেন তিনি। বেশি পণের লোভে বৃদ্ধ জমিদার জনার্দন চৌধুরীর সঙ্গে কঙ্কাবতীর বিয়ে ঠিক করেন। কিন্তু এই বিয়েতে নারাজ কঙ্কাবতী ভয়ানক জ্বরে আক্রান্ত হয়। জ্বরবিকারে সে নানারকম অকল্পনীয় স্বপ্ন দেখে ও সেগুলিকে সত্যি বলে মনে করে। প্রথমেই সে দেখে কাতলা মাছের সঙ্গে সে নদীর নীচে ডুব দিয়েছে, সেখানে ভিন্ন ভিন্ন জাতের মাছ এসে তাকে ঘিরে ধরেছে। মাছেদের ছেলেমেয়েরা তার সাথে খেলতে চাইছে। কিন্তু মাছেরা সমবেতভাবে কঙ্কাবতীকে রানি করে রেখে দিতে চায়, তাই তারা প্রস্তুতি শুরু করেছে। খেতুকে রাজা করার কথাও তাদের ভাবনায় আছে বলে জানা যায়। তবে শেষপর্যন্ত রানি কঙ্কাবতীর স্থান হয় মোতিমহল অর্থাৎ ঝিনুকের মধ্যে। সেখানে থেকেই সে রানিগিরি করতে থাকে। [‘কঙ্কাবতী’ খণ্ডাংশ – ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়]

গল্প ৩।

সানু ছেলেমানুষ, জন্মদিনে এয়ারগান-বইপত্র-ক্যামেরা উপহার পেলেও তার আসল ডিমান্ড যে মোটর সাইকেল, তা না পাওয়ায় খুব দুঃখ পায়। সে ছোটো বলে কেউ তাকে মোটর সাইকেল কিনে দিতে চায় না। কিন্তু তার খুব ইচ্ছা মোটর সাইকেলে স্পিড তুলে কলকাতার রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। এই দুঃখ মনে চেপেই সে রাতে ঘুমিয়ে পড়ে। স্বপ্নে দেখে, মোটর সাইকেলে ১০০ কিলোমিটার স্পিড তুলে সে তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে ছুটে চলেছে, সঙ্গী দুধরাজকুমার। এরপর ফুলরাজকুমারকে সাতশো রাক্ষসীর হাত থেকে উদ্ধার করে রীতিমতো বীর হয়ে ওঠে সানু। স্বপ্ন ভাঙতেই গোটা বিষয়টি পরিষ্কার হয় সানুর কাছে। [‘সানু ও দুধরাজকুমার’ – প্রেমেন্দ্র মিত্র]

তিনটি গল্পে একটি অতিসাধারণ সাদৃশ্য খুব সহজেই পাঠকের নজর কাড়ে, তা হচ্ছে স্বপ্ন। জাগ্রত অবস্থায় যে মানসিক ক্রিয়া চলে, নিদ্রিত অবস্থাতেও তার বিরাম ঘটে না, কেবল শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হয় মাত্র- “According to the Aristotle, the dream is a continuation of thinking in sleep”।[৩] সেই স্বপ্নের হাত ধরে আরও একটি সাদৃশ্য গল্পগুলিতে লক্ষিত হয়, তা হচ্ছে ইচ্ছেপূরণ। প্রতিটি গল্পেই কোনো না কোনো ইচ্ছের সিদ্ধিলাভ ঘটে। প্রথম দুটি গল্পে এই ইচ্ছের প্রকাশ প্রচ্ছন্ন থাকলেও তৃতীয় গল্পে তা প্রকটভাবেই সামনে এসেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, যাদের স্বপ্ন বা ইচ্ছেপূরণের গল্প এখানে শোনানো হয়েছে তারা কেউ কৈশোরের গণ্ডি পেরোয়নি। স্বপ্নের হাত ধরেই যে ছোটোদের অবদমিত বাসনা পূর্ণ হয়, সে সম্পর্কে যিনি প্রধানত আলোচনা করেছেন তিনি সিগমুন্ড ফ্রয়েড (Sigmund Freud)।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্যে প্রথম স্বপ্ন নিয়ে বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা শুরু হয়। রবার্ট (Robert) নামে একজন বৈজ্ঞানিক জানান, স্বপ্ন হচ্ছে জাগ্রত অবস্থায় ব্যাহত চিন্তারাশির পূর্ণবিকাশের একটি উপায় মাত্র। দৈনন্দিন জীবনে অনেক চিন্তা নানা কারণে অসমাপ্ত অবস্থায় জমে থাকে, স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে সেগুলির পূর্ণ পরিণতি ঘটে। মানসিক কোনো ক্রিয়া ব্যাহত অবস্থায় জমে থাকলে মনে তীব্র অস্বাচ্ছন্দ্যের সৃষ্টি হয়। স্বপ্নের কাজ হচ্ছে সেই অস্বাচ্ছন্দ্য দূর করে মনে শান্তি আনা। এরপর ডিলাজ (Delage), বুড়্ডাক্ (Burdach), পুরকীন্জী (Purkinje) প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ স্বপ্ন গড়ে ওঠার পেছনে মানসিক বৃত্তির প্রভাব স্বীকার করে নিয়েছেন। ১৯০০ সালে ফ্রয়েড তাঁর ‘Interpretation of Dreams’ গ্রন্থে স্বপ্ন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, যা পরবর্তীকালের মনোবিদ্‌দের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে।

চিকিৎসক ফ্রয়েড মানসিক রোগের চিকিৎসা করতে গিয়ে মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতি অনুসরণ করে বুঝতে পারেন, মানুষের স্বপ্ন তার মনের অনেক ঝড়-ঝঞ্ঝার সাক্ষ্য দেয়। তার অতীত, অপূর্ণ কামনা-বাসনা, খারাপ অভিজ্ঞতা, যা কিছু অবদমিত থাকে তার মনের নির্জ্ঞান স্তরে (Unconscious), সে সমস্তই নিদ্রিত অবস্থায় প্রহরীর চোখকে ফাঁকি দিয়ে রূপ বদলে প্রতীকের আশ্রয় নিয়ে সংজ্ঞানে (Conscious) উঠে আসতে চেষ্টা করে। এই অবদমিত কামনা অনেকসময়ে সমাজবিরুদ্ধ হয় তাই প্রতীকের সাহায্যে রূপ বদলানোর প্রয়োজন পড়ে। সরাসরি নিজস্ব চেহারায় তারা দৃশ্যায়িত হতে পারে না। কিন্তু ফ্রয়েড দেখলেন, ছোটোদের স্বপ্ন এত জটিল নয়। তাদের স্বপ্নে কোনো প্রতীক বা ছদ্মবেশের আভাস থাকে না- ‘...the undisguised...dreams were found chiefly in children;...’।[৪] শিশুদের স্বপ্ন সরল। শিশুরা তাদের জাগ্রত অবস্থায় যা চেয়ে পায় না, সেটিকেই স্বপ্নে দেখে। জাগরণের অতৃপ্ত ইচ্ছা পূর্ণ হয় স্বপ্নে। জাগ্রত অবস্থায় তাদের আকাঙ্ক্ষার রূপই স্বপ্নের মধ্যে ফুটে ওঠে। ফ্রয়েডের মতে- “...it may have been excited during the day, and owing to external circumstances may have remained unsatisfied; there is thus left for the night an acknowledged and unsatisfied wish.”[৫] আমাদের আলোচ্য তিনটি গল্পেও ঠিক এই তত্ত্বই পরিস্ফুট হতে দেখি। রাখাল, কঙ্কাবতী ও সানু- তিনজনেই বাস্তব জীবনে যা পায়নি বা পাওয়া সম্ভব নয় বলে জেনেছে, স্বপ্ন তাদের সেই অপ্রাপ্তির দুঃখমোচন করেছে। তিন শিশু-কিশোরের অবদমিত বাসনা সরাসরিভাবে স্বপ্নে চরিতার্থ হয়েছে, কোনোরকম জটিলতার ধার ধারেনি। ফ্রয়েডের সিদ্ধান্ত তাই মেনে নিতেই হয়-

The dreams of little children are often simple fulfillments of wishes, and for this reason are, as compared with the dreams of adults, by no means interesting. They present no problem to be solved, but they are invaluable as affording proof that the dream, in its inmost essence, is the fulfillment of a wish.[৬]

গল্প তিনটিতে চরিত্রদের ইচ্ছাপূরণ হয়েছে ঠিকই, কিন্তু সেই সাথে লক্ষণীয় চরিত্রগুলি যেন ফিরে গেছে তাদের একেবারে ছোটোবেলার স্মৃতিতে, কখনো বা তারও পূর্বে অর্থাৎ প্রাগৈতিহাসিক পর্বে। কিন্তু কীভাবে? এবার সেই বিশ্লেষণেরই চেষ্টা করা হবে। গল্প ৩-এর সানু মোটর সাইকেলে চড়ে কলকাতায় ঘুরে বেড়ানোর ইচ্ছা দমন করেছিল। তবে সে স্বপ্নে মোটর সাইকেল নিয়ে রূপকথার দেশে পাড়ি জমালো কেন? গল্প ২-এর কঙ্কাবতীর ইচ্ছা ছিল খেতুকে বিয়ে করার, কিন্তু তার জন্য স্বপ্নে সে মাছেদের রাজ্যে ডুব দিয়ে খেতু রাজার কঙ্কাবতী রানি হয়ে ঝিনুকের মধ্যে বাস করতে লাগল কেন? গল্প ১-এর রাখাল অবচেতনে রাজা হওয়ার বাসনা গোপন করে রেখেছিল এতকাল, স্বপ্নে তার সেই সিদ্ধিলাভ ঘটল। কিন্তু শুধু এই বাসনাটুকুর জন্যই কি তার ভাঙা রাজপুরীর দিকে চেয়ে থাকলেই মন কেমন করে? নাকি প্রাগৈতিহাসিক কোনো স্মৃতি পুরুষানুক্রমে রাখালের নির্জ্ঞান মনে এসে জমা হয়েছে? এই সকল প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় ফ্রয়েডের একটি বক্তব্যে-

We are obliged to regard it as part of the archaic heritage which a child brings with him into the world, before any experience of his own, as a result of the experience of his ancestors. We find elements corresponding to this phylogenetic material in the earliest human legends and in surviving customs. Thus dreams offer a source of human prehistory which is not to be despised.[৭]

শিশু সরল হলেও তার মন কিন্তু অতলস্পর্শী। পূর্বপুরুষদের যাবতীয় অভিজ্ঞতা নির্জ্ঞান মনে সঞ্চয় করে সে পৃথিবীতে আসে। শুধু তাই নয়, প্রাণের বিবর্তনে সঞ্চিত প্রাণেরই আদিমতম সব স্মৃতি, যেমন- জলজীবন, উদ্ভিদজীবনের স্মৃতি, বা মানুষ হয়ে ওঠার পথে বিবর্তনের যাবতীয় ইতিহাস-ঐতিহ্য সব কিছু বহন করে চলে সে নিঃশব্দে। ফ্রয়েড শিষ্য কার্ল গুস্তাভ ইয়ুং (Karl Gustav Jung) মনের এই নির্জ্ঞান স্তরকেই নাম দিয়েছেন যৌথ-

নির্জ্ঞান বা Collective Unconscious। শিশুর চেতন মন এ সম্পর্কে থাকে অজ্ঞাত। কিন্তু স্বপ্নের প্রধান কাজ হচ্ছে প্রাগৈতিহাসিক ও শৈশব জগতের স্মৃতিচারণ বা পুনর্ভাবন, একেবারে আদিমতম প্রবৃত্তির শেষ স্তর পর্যন্ত আন্দোলিত করা। ইয়ুং-এর বক্তব্য- “Many dreams even go beyond the personal problems of the individual dreamer and are the expression of problems that occur over again in human history and concern the whole human collective.”[৮] তাই রাখালের ‘মন কেমন’ করা নেহাত চেতন মনের ক্রিয়া নয়, এ যেন সুদূর অতীতের কোনো এক রাজা ও তার রাজ্যের ইতিহাস পুনরুত্থাপন, নির্জ্ঞান মন থেকে উঠে আসা এক দীর্ঘশ্বাস। কঙ্কাবতীর জলযাপন আসলে প্রজাতিজনিত স্মৃতি। ভ্রূণ দেহ যেমন মানবজাতির বিবর্তনের সাক্ষ্য বহন করে, মানবমনও ঠিক তাই। আদি থেকে বর্তমান সকলকে সঙ্গে নিয়ে তার বিকাশলাভ; কিন্তু তা সত্ত্বেও স্বপ্ন ফিরিয়ে দেয় বংশ ও জাতির ক্রম বিবর্তনের পূর্বতন ইতিহাস, চেতন মনের অজান্তেই। সানুর স্বপ্ন তাকে রূপকথাচারী করেছে। যে রূপকথা শুনে সৃষ্টির আদিকাল থেকেই শিশু বেড়ে উঠেছে, সেই আজন্মলালিত রূপকথার স্মৃতি স্বপ্নে সে ফিরে পেয়েছে। আসলে রূপকথার এই সঞ্চয় সানুর একার নয়। যাদের কথা ভেবে কবিগুরু লেখেন- “জগৎ পারাবারের তীরে ছেলেরা করে মেলা” [৯], সেই চিরকালীন শিশু-কিশোরের পুরুষানুক্রমিক সঞ্চয় স্বপ্ন হয়ে এসেছে সানুর কাছে। তাই সে মোটর সাইকেলে চেপে পুনরায় ফিরে যেতে চেয়েছে রূপকথার রাজ্যে। তাই এই তত্ত্বের উপর নির্ভর করে বলা চলে, শিশু-কিশোর মন আপাত সরল ও নবীন হলেও তা আসলে বহু জটিল ও প্রবীণ। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মন্তব্য শিরোধার্য – “ভালো করিয়া দেখিতে গেলে শিশুর মতো পুরাতন আর কিছুই নাই।” [১০]

তথ্যসূত্র :

১। রতনতনু ঘাটী, ‘রূপকথা হারিয়ে যায় না’ , অন্তর্গত কিশোর সংগ্রহ, নির্মল বুক এজেন্সি, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০১৬, পৃ. ৩১১

২। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, এবং সুধীন্দ্র, সরকার (সম্পা), বাংলার রূপকথা, পুনশ্চ, কলকাতা, সর্বশেষ সংস্করণ: জানুয়ারি ২০১৯, পৃ. ১০৩

৩। Sigmund Freud, Interpretation of Dreams, Wilco Publishing House, Mumbai, India, 2014, p-488

৪। Ibid, p-489

৫। Ibid.

৬। Ibid, p-118

৭। Sigmund Freud, An Outline of Psycho-Analysis, The Hogarth Press and the Institute of Psycho-Analysis, London, 1949, p-28

৮। Jolan Jacobi, The Psychology of C. G. Jung, Kegan Paul Trench, Trubner & co Ltd, London, England, 1942, p-40

৯। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী (৫ম খণ্ড), বিশ্বভারতী, ১২৫তম জন্মজয়ন্তীতে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ: পৌষ ১৩৯৪, পৃ. ৫

১০। রবীন্দ্রনাথ, ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী (১৩শ খণ্ড), পশ্চিমবঙ্গ সরকার, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ ২৫ বৈশাখ ১৩৬৮, পৃ ৬৬৬

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে ইতিহাস আশ্রিত কাব্য : সমাজ ও সংস্কৃতির বৈচিত্র্য

জয়ন্ত বিশ্বাস

গবেষক, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

মানুষের ভাব-চিন্তা-কর্মে- আচরণে যা কিছু অভিব্যক্তি পায়, তার কিছুটা প্রাণিসুলভ সহজাত, আর কিছুটা মননলব্ধ তথা অর্জিত। এ দুটোর সংমিশ্রণে অবয়ব পায় মানুষের চরিত্র, অভিব্যক্ত হয় জীবনাচরণ। অনুশীলন-পরিশীলনের স্তরভেদে কোনো বিশেষ স্থানে ও কালে ব্যষ্টি ও সমষ্টির আচার-আচরণে কখনো প্রাণিসুলভ স্থূল অসংযত স্বভাব প্রবলভাবে প্রকাশ পায়; কখনো বা অর্জিত আচরণ প্রাধান্য পায়। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই কখনো অবিমিশ্র বা অন্যপক্ষ কোনো আচরণ সম্ভব নয়। তাই আজকের সভ্যতম সংস্কৃতিবান মানুষের মধ্যেও আদিম মানুষের আচার-আচরণের ছিটেফোঁটা মেলে—কখনো আদিরূপে; কখনো বা রূপান্তরে।

বিভিন্ন স্থানে বিচিত্র ব্যবহারিক-বৈষয়িক প্রয়োজনে ও মানসিক কারণে নানা স্থানের না গোত্রীয় মানুষের সম্পর্কজাত নানা পারস্পরিক প্রভাব মানুষের শাস্ত্র, সমাজ, সংস্কার, সংস্কৃতি ও চিন্তা-চেতনা বহুমুখী, বিচিত্রধর্মী ও জটিল হয়ে উঠেছে। কারা কাদের প্রভাবে কী পেয়েছে কিংবা কী হয়েছে, তা আজ নিঃসংশয়ে বলা বা বোঝা সম্ভব নয়। তবু আমাদের জিজ্ঞাসার জবাব খুঁজতে হয় এবং সন্ধানে, নিদর্শনে, বিশ্লেষণে, প্রমাণে ও অনুমানে যা মেলে, তা দিয়েই মনোময় উত্তর তৈরি করে আমরা আমাদের কৌতূহল মেটাই এবং বর্তমান ও ভবিষ্যতের কোনো মানবিক সমস্যার মুল্যানুসন্ধানে, কার্যকারণ সম্পর্ক নিরূপণে ও সমাধানচিন্তায় সে জ্ঞান ও সিদ্ধান্ত কাজে লাগাই।

মানুষের মনন ও আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয় জন্মসূত্রে লব্ধ পারিবারিক-সামাজিক-শাস্ত্রিক-সাংস্কৃতিক বিশ্বাস-সংস্কার, রীতি-রেওয়াজ, নীতি-আদর্শ, প্রথা-পদ্ধতি-প্রতিষ্ঠান, উৎসব-পার্বণ প্রভৃতির প্রভাবে। অতএব, সামাজিক আচরণমাত্রই কৃত্রিম তথা অর্জিত, অনুশীলিত ও পরিস্রুত। আমাদের আলোচ্য মধ্যযুগের ইতিহাস আশ্রিত কাব্যে প্রথাসম্বলিত সেই সামাজিক আচরণ, সংস্কৃতি কতটা ফুটে উঠেছে সে সম্পর্কে জানার আগ্রহ থেকেই এই অধ্যায়ের অবতারণা। ঐতিহাসিক ঘটনাকে কেন্দ্র করেও কিংবা একটি জাতির সামাজিক আচার- সংস্কৃতিকে স্থান দিয়েও ইতিহাস আশ্রিত কাব্যগুলি কীভাবে বিচিত্র হয়ে উঠেছে সে সম্পর্কে অনুসন্ধানই আমাদের লক্ষ্য।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বিধৃত সমাজ ও সংস্কৃতির বৈচিত্র্যের বিভিন্ন নিদর্শ আমরা পাই। বাংলা সাহিত্যের সূচনালগ্ন 'চর্যাপদ' থেকে শুরু করে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য হয়ে মধ্যযুগের আরও বিভিন্ন কাব্যের মধ্যেও সামজিকতার বৈচিত্র্য ধরা পড়েছে একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। আমাদের গবেষণার মধ্যে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস আশ্রিত কাব্য কবিতার প্রাধান্য থাকলেও এই অধ্যায়ে আলোচনার শুরুতে সামাজিক বৈচিত্র্যের বিবর্তনটি আলোচনা করার প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি।

একথা আমরা বলতে পারি যে, ফারসি ভাষা চিরদিনই মুসলমান আমলে সরকারী ভাষা ছিল। ফারসি ভাষা স্বাধীন বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে হিন্দু মুসলমানের দ্বারা চর্চা হত। সরকারী ভাষার মর্যাদা লাভ করেছিল বলে অনেকেই বাধ্য হয়ে এই ভাষা শিখত। আবার মুসলমানদের সাংস্কৃতিক ভাষা হিসেবেও অনেকেই এই ভাষার অনুশীলন করতো। এই সময়ে ফারসি ভাষা ও সাহিত্য এবং মুসলমানদের পোশাক-পরিচ্ছদ কীভাবে বাংলার হিন্দুদের মধ্যে বহুল প্রচলিত হয়েছিল তার কিছু উদাহরণ ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' কাব্যে দেখতে পাওয়া যায়। কাব্যে জগাই-মাধাই নামক যে দুজন বৈষ্ণবদ্রোহী হিন্দুকে চৈতন্যদেব বৈষ্ণব মতে দীক্ষিত করেছিলেন তাদের সম্পর্কে জয়ানন্দ লিখেছেন–

"মসনবি (মনসরি) আবৃত্তি করে থাকে নলবনে।

মহাপাপী জগাই মাধাই দুই জনে।।”

কলিকালের অর্থাৎ চৈতন্যদেবের সমসাময়িককালে হিন্দু সমাজের বিদ্যা, আচার-আচরণ প্রভৃতির বর্ণনা প্রসঙ্গেও জয়ানন্দ তাঁর কাব্যের মধ্যে ফুটিয়ে তুলেছেন এইভাবে–

“ব্রাহ্মণে রাখিবে দাঁড়ি পারস্য পড়িবে।

মোজা পা-এ নড়ি হাথে কামান ধরিবে।।

মনসরি আবৃত্তি করিবে দ্বিজবর।

ডাকা চুরি ঘাটি সাধিবেক নিরন্তর।।”

কাব্যপাঠে আমরা দেখি যে ব্রাহ্মণরা মুসলমানের মতো দাড়ি রাখতে শুরু করেছে। শুধু তাই নয়, সংস্কৃত ছেড়ে ফারসি ভাষা পড়ছেন। তারা পায়ে ‘মোজা’ পরিধান করে এক হাতে যষ্ঠি ও অন্যহাতে কামান বা বন্দুক ধারণ করেছেন এবং মুখে মুখে পারস্যের সুফী কবি মৌলানা জালালুদ্দীন রূমীর (১২০৭-১২৭৩ খ্রিস্টাব্দ) ‘মসনবি’ গ্রন্থ আবৃত্তি করছেন। এই তো ছিল তখনকার দিনের হিন্দু সমাজের অবস্থা। সুতরাং, ফারসি সাহিত্যের নানা প্রভাব যে হিন্দু-মুসলমানের বাংলা সাহিত্যে পড়বে তাতে আর বিচিত্র কী? বলা যায় এই প্রভাব বিশেষত শব্দ, বিষয়, ভাব ও অনুবাদ এই বিভিন্ন প্রকারই বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছে।

মুসলমান রচিত বাংলা সাহিত্যের প্রায় সবটাই হিন্দি-আওধি-ফারসি-আরবী গ্রন্থের ভাব অনুবাদ। অনুবাদকরা তাদের সাহিত্যের প্রায় সব জায়গাতেই ইচ্ছেমতো গ্রহণ, বর্জন ও সংযোজন করেছেন। বাংলা সাহিত্যের প্রণয়োপাখ্যানগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে অমুসলিম কাহিনি হলেও মুসলিম কবির নীতিবোধের বা সামাজিক নীতির পরিপন্থি ছিল না। দেব-দেবীর মাহাত্ম্য বিষয়ক কথা ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে রীতি-নীতি ও সংস্কারে হিন্দু-মুসলমানের পার্থক্য ছিল না হয়তো। বিদেশি বিভাষা থেকে অনুবাদ হলেও নৈতিক, সামাজিক আচার-আচরণে দেশীয় আবহ ও সংস্কার রক্ষিত হয়েছে। আবার হিন্দু নায়ক-নায়িকার কাহিনি বর্ণনায় কবি অজান্তেই মুসলিম নীতি প্রয়োগ করেছেন, অথবা সুদূর অতীতের কথা প্রয়োগ করেছেন। ‘সতী ময়না’ বা ‘লোরচন্দ্রাণি’ কাব্যে লোররাজ কর্তৃক বামন-বউ চন্দ্রাণিহরণ ও তাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ তো উক্ত ঘটনারই সাক্ষ্য বহন করছে।

১২০৪ খ্রিস্টাব্দে বখতিয়ার খলজী বাংলায় প্রথম মুসলিম রাজত্বের প্রতিষ্ঠা করলেও, ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ দিককেই বাংলায় মুসলমান আধিপত্য বিস্তারের সক্রিয় যুগ হিসেবে বলা যায়। এই সময় থেকেই ইসমাইল গাজী এবং মুসলমান সন্তগণ বাংলার ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্রমবর্ধমান ভূমিকায় অংশগ্রহণ করতে শুরু করেন।

মধ্যযুগের বাংলার এই সকল সন্ন্যাসী যোদ্ধারা ছিলেন খ্রিস্টের সমাধি রক্ষাকারী যোদ্ধাবর্গের মতো ইসলামের রক্ষাকর্তা। মুসলমান শাসকের তরবারি যখন দিকে দিকে প্রভাব বিস্তার করতে লাগলো, তখন এই সমস্ত সন্তরা বিধর্মীদের ইসলামের ছত্রছায়ায় আনতে লাগলেন। যদিও এ বিষয়ে ইতিপূর্বে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। বলাবাহুল্য এই সন্ত বা ফকীরেরা অহিংসবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না। এই সন্তরা হিন্দুরাজ্য সীমায় যে কোনোভাবে প্রবেশ করে বসতি স্থাপন করতেন। পরে হিন্দুদের কাছে মহাপাপ বলে বিবেচিত গো-হত্যা ইত্যাদি কাজে বাঁধা পেয়ে ইসলাম অধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে পার্শ্ববর্তী মুসলিম রাজ্যে গিয়ে সাহায্য প্রার্থনা করতেন এবং পেশাদারী সৈনিক আমদানি করে হিন্দুরাজ্য অধিকার করে নিতেন। আর এক শ্রেণির সাধু ছিলেন যারা নিম্নশ্রেণির অশিক্ষিত লোকের কাছে হিন্দুশাস্ত্রের ও অনুষ্ঠানের নিন্দা করে তাদের ধর্মান্তরিত করতেন।

আসলে ভারতবর্ষে ইসলামের প্রচার প্রধানত দুটি ভিন্ন পদ্ধতিতে চলছিল, ‘তুর্কানা পদ্ধতি’ এবং ‘সুফিয়ানা পদ্ধতি’। তুর্কী সেনার কাছে হিন্দুদের মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য করা , মঠ ও মন্দির ধ্বংস করা এবং মসজিদ প্রতিষ্ঠা করা এসবই ছিল তাদের কাছে অত্যন্ত পূণ্যকর্ম। তবে হিন্দুদের এই ভয়সূচক মনোভাবই একমাত্র সত্য নয়। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে তারাও রুখে দাঁড়িয়ে বাঁধা দিয়েছে। সতেরো শতকের কবি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের ‘মনসামঙ্গল’ কাব্যে এই প্রতিরোধের একটি সুস্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়। কাব্যের ‘হাসান-হোসেন’ পালায় আমরা এর প্রমাণ পাই–

“বাসু বলে আরে নর‍্যা নাড়া ব্যাটায় দেহ মার‍্যা

কানে ধর‍্যা দেহ গোছমান

আমার বচন ধর টাকায়্যা টাকায়্যা মার

কি করিবে হাসন হুসন

ধরিয়া বেটার ঘাড় বজ্র মুটিকা মার

টিকরে টাকরে ভাঙ্গ খুলি।”

এর পরেই আমারা দেখতে পাই–

“রাখালে ধরিল তারে বেড়য়।।

মারিয়া মুদগর বাড়ি।।

বালা পাগড়ি নিল কাড়ি।

টাকরে টাকরে গেল ছিড়ি।।

টাক্যা হইল রক্তবর্ণ

মুচলে ছিড়িল কন্য।।” [১]

সমাজচিত্রের শুধু এই বর্ণনাই নয়। কাব্যপাঠে আমরা এইরকম আরও চিত্র খুঁজে পাব। বস্তুত ক্ষেমানন্দের কাব্যে সপ্তদশ শতাব্দীর বাঙালি জীবন বিভিন্ন প্রসঙ্গে চিত্রিত হয়েছে। বেহুলার যাত্রাপথের বাইশটি ঘাটের বিবরণ, লখিন্দরের বিবাহ, জন্ম প্রসঙ্গ, জাতকর্মের বিবরণ প্রভৃতি সমকালীন বাঙালি জীবনের পরিচয় বহন করেছে এই কাব্য। এমনকি সহমরণ প্রথার মতো সামজিক কুপ্রথার পরিচয়ও রয়েছে শিবের সাময়িক মৃত্যুতে গঙ্গার সহমরণ ইচ্ছার মধ্যে। ক্ষেমানন্দের কাব্যের একটি দৃষ্টান্ত এক্ষেত্রে আমরা উল্লেখ করতে পারি–

“প্রাণনাথ কোলে কান্দে বেহুলা নাচনী।

ঘর হৈতে শোনে সোনকা বাণ্যানী।।

ক্রন্দন শুনিয়া তার শুকাইল হিয়া।

পুত্রবধূ দেখিবারে চলিল ধাইয়া।।” [২]

হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে এবার আমারা আলোকপাত করবো অন্যান্য সামাজিক বৈচিত্র্যের দিকে; যার নিদর্শন ছড়িয়ে রয়েছে মধ্যযুগের বিভিন্ন কাব্যধারার মধ্যে। ইসলামি ঐতিহ্যকে অনুসরণ করে যে ‘জঙ্গনামা’ শ্রেণির সাহিত্যধারা সতেরো শতক থেকে প্রবহমান, তার ভাষা যেমন বিশুদ্ধ বাংলা, তেমনি পর্ব বিন্যাস, চরিত্রায়ন, নামকরণ এমনকি ছন্দ অলংকারের উপর পর্যন্ত হিন্দু কবিদের প্রভাব সুস্পষ্ট। ‘জঙ্গনামা’ শ্রেণির কাব্যের প্রভাব এড়াতে পারেননি হিন্দু কবিরাও। আঠারো শতকে উত্তর রাঢ়ের রাধাচরণ গোপের রচিত ‘ইনামের কেচ্ছা’ ও ‘আফাৎনামা’ এবং চন্দ্রাভান ব্রাহ্মণের রচিত ‘চাহার চমন’ এর প্রকৃত উদাহরণ।

‘জঙ্গনামা’ ইতিহাস ও ধর্মমূলক বিষয়ের সমন্বিত একটি কাব্য। ১১০১ বঙ্গাব্দে কবি মহম্মদ ইয়াকুব আলী মরহুম বীর ও করুণ রসপূর্ণ ‘জঙ্গনামা’ ধারার একটি কাব্য রচনা করেন। যদিও মুসলমান কবিদের মধ্যে অনেকেই এই ‘জঙ্গনামা’ সাহিত্য রচনা করেছেন। বাংলার মুসলমান কবি যাঁরা ‘জঙ্গনামা’ নামক কাব্য রচনা করেছেন সেই সমস্ত কাব্যে কারবালার ইতিহাস এবং কারবালার যুদ্ধের ঘটনাবলী স্থান পেয়েছে। কাব্যের মধ্যে

কোথাও যুদ্ধের কারণ, যুদ্ধের পরিণতি, যুদ্ধের ভয়াবহতা ইত্যাদি বিষয় স্থান পেয়েছে। আরও একটি বিষয় আমরা এক্ষেত্রে উল্লেখ করতে পারি তা হল, এই কাব্যের সামাজিক দিক। ইতিহাস আশ্রিত কাহিনির উপর ভিত্তি করেই 'জঙ্গনামা' র ঐতিহাসিকতা অর্থাৎ কারবালার ইতিহাস বিধৃত রয়েছে।

আমরা যদি মোহম্মদ ইয়াকুব আলী মরহুমের 'জঙ্গনামা' কাব্যের দ্বিতীয় অংশের দিকে লক্ষ করি তাহলে সেখানে দেখতে পাব যে আব্দুল্লা জব্বার প্রচুর সম্পত্তির লোভে তাঁর পরমা সুন্দরী স্ত্রী জয়নাব বিবিকে তালাক দিয়ে মোয়াবিয়া কন্যাকে বিবাহ করতে সম্মত হন। বিবাহের সময় এজিদ 'বকিল' বেশে বোনের সম্মতি জানার জন্য অন্দরে গিয়ে ফিরে এসে বলেন–

"কহিতে লাগিল আসি সভার হুজুরে।
কবুল না কইল বিবি আব্দুল্লা জব্বারে।।
বিবি বলে শুনিয়াছি এই সমাচার।
পরম সুন্দরী বিবি ঘরে আছে তার।।
যদি সে তালাক দিয়া ছাড়ে সেই বিবি।
তবে তো কবুল আমি করিব সেতাবি।।" ৩

স্বভাবতই আবদুল্লা জব্বার জয়নাব বিবিকে তালাক দিলেন। কিন্তু তাকে তালাক দেওয়ার পরও মোয়াবিয়া কন্যার সঙ্গে আবদুল জব্বারের বিবাহ হল না। আর এখানেই সমাজচেতনা দারুণভাবে ধরা পড়েছে। মোয়াবিয়া কন্যার বক্তব্যকে এজিদ জানিয়ে দেয় এইভাবে–

"ঘড়ি এক বাদে আসি আব্দুল্লাকে বলে।।
না করে কবুল তুঝে শুনহ জব্বার।
এই কথা শুনি বিবি হইল বেজার।।
মস্কারা বলিয়া তুঝে বিবি যে কহিল।
মাল মুলুকের লোভে জয়নাবে ছাড়িল।।
বেলাত মেসের, শাম পাইয়া আমারে।
লায়েক আওরত যে ছাড়িয়া নেকা করে।।
কদাচিত যদি বাবা মুল্লুক ছড়ায়।
এসাই তালাক দিয়া ছাড়িবে আমায়।।

এমন মস্কারা লোকে কেবা কোথা চায়।
শুনিয়া তামাম লোক করে হায় হায়।।” ৪

অর্থাৎ সে আবদুল্লা জব্বারকে পতি হিসাবে বরণ করতে প্রস্তুত নয়। মোয়াবিয়া কন্যার বক্তব্য, যে ব্যক্তি ধনসম্পত্তির লালসায় অমন রূপবতী ও গুণবতী স্ত্রীকে তালাক দিতে পারে, সে যে অপর কোনো ব্যক্তির ধনসম্পত্তির লালসায় তাকে (মোয়াবিয়া কন্যা) ত্যাগ করবে না, যদি কখনো তার পিতা মিসরাদি দেশ (মোয়াবিয়া মিসর দেশ সম্পত্তি হিসাবে জব্বারকে দিতে ছেয়েছিলেন) তার (জব্বার) কাছ থেকে কেড়ে নেন তাহলে যে তিনি তাকে এইভাবে ত্যাগ করবেন না, তারই বা বিশ্বাস কী?

‘জঙ্গনামা’ কাব্যে মোয়াবিয়া কন্যার মধ্যে যে ধরনের সমাজচেতনার পরিচয় আমরা পেয়েছি, ঠিক সেইরকমই সমাজচেতনার পরিচয় আমরা পাই সৈয়দ আলাওলের ‘পদ্মাবতী’ কাব্যে। এই কাব্য সম্পর্কে সমাজ চেতনার বিস্তারিত বিবরণ আমরা এই অধ্যায়েই ক্রমান্বয়ে রাখব। এই কাব্যের প্রতিনায়িকা রজুসেন পত্নী নাগমতি। পদ্মাবতীর প্রতিপক্ষে থাকলেও চরিত্রটি কখনোই ব্যক্তিত্বে ও গুরুত্বে পদ্মাবতীর সমমর্যাদা লাভ করেনি। পুরুষ শাসিত সমাজে একজন পতি অনুগত্যা নারী সৌভাগ্য ও বঞ্চনাকে সমানভাবে মেনে নিয়েই সে কাব্যে অবস্থান করেছে। নাগমতির একান্ত বিশ্বাস হল–

“সুরূপে কুরূপে কেহ না গোঙায় কাল।
যারে স্বামী দয়া করে সেই নারী ভাল।।”

সমাজে নারীচেতনার এই দৃষ্টান্ত যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক বলে মনে হওয়াটাই স্বাভাবিক।

ইতিহাস আশ্রিত কাব্য-কবিতা আলোচনার সূত্র ধরে আমরা ইতিহাসের সঙ্গে কাব্যের কিংবা কাব্যের সঙ্গে ইতিহাসের সাযুজ্য আমরা দেখানোর চেষ্টা করছি। মধ্যযুগের বাংলা কাব্য-কবিতায় ইতিহাস যেভাবে প্রাধান্য পেয়েছে তা শুধু রাষ্ট্রিক, রাজনৈতিক ইতিহাস নয়। রয়েছে সমাজ জীবনের ইতিহাস, বাঙালি মানসিকতার ইতিহাস, সংস্কৃতির ইতিহাস। আমরা জানি সপ্তদশ শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্যের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্য হল রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান জাতীয় কাব্য। এই প্রণয়ধর্মকে সাহিত্যে টিঁকিয়ে রাখাও ইতিহাস। সেই প্রণয়ধর্মীতার ইতিহাস বিধৃত রয়েছে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে রচিত প্রণয়োপাখ্যানধর্মী বিভিন্ন কাব্য।

ষোল শতকের কবি শাহ মুহম্মদ সগীর ‘ইউসুফ জোলেখা’ কাব্যের প্রণেতা। কাব্যের উপজীব্য বিষয়, নায়ক ইউসুফ ও নায়িকা জোলেখার প্রণয় কাহিনি। তবে কাব্যটি সগীরের মৌলিক রচনা নয়। প্রাচীনকাল থেকে বাইবেল ও কোরানে ইউসুফকে কেন্দ্র করে নৈতিক উপাখ্যান চলে আসছে। এই কাহিনি অবলম্বনে ইরানীয় কবি আবুল

কাসেম ফিরদৌসী ও সূফী কবি আবদুর রহমান জামী উভয়ে ‘ইউসুফ-জোলেখা’ নামে কাব্য রচনা করেছেন। কাব্যে সমাজচেতনার বৈচিত্র্য আমরা খুঁজে পাই। হিন্দু-মুসলমানের সংস্কৃতির বিরোধ এবং মেলবন্ধন আমরা এই এই অধ্যায়ে বিভিন্ন কাব্যের দৃষ্টান্তসহ আলোচনা করেছি। আমরা দেখেছি যে, মধ্যযুগে একটা সময় ছিল যখন হিন্দু-মুসলমান সামাজিক সম্পর্ক তো দূরের কথা, বর্ণবিদ্বেষ তথা উচ্চ-নীচ ভেদাভেদের প্রাচীরও সমাজে প্রবলভাবে ছিল। শাহ মুহম্মদ সগীরের ‘ইউসুফ-জোলেখা’ কাব্যে বিবাহ প্রসঙ্গে এই মনোভাবের পরিচয় মেলে। উচ্চবর্ণের হিন্দুর বিবাহের অন্তরায় ছিল কৌলীন্য প্রথা। কাব্যে আমরা দেখি জোলেখার বিবাহের সময় জোলেখার বাবাও উচ্চ বংশজাত আজিজ মিছরের সঙ্গে তার মেয়ের বিবাহ দিয়েছেন। এমনকি বিবাহের পূর্বে জোলেখাকে ঘরে আটকে রাখা হয়েছে, যাতে কোন নিম্নবর্গীয় বা অমর্যাদা সম্পন্ন ঘরে সে বিবাহ করতে না পারে। এছাড়া সম্ভ্রান্ত হিন্দু বা মুসলমানের সঙ্গে অন্ত্যজ শ্রেণির হিন্দু বা মুসলমানের কোনরকম সামাজিক সংযোগ ছিল না সেই সময়ের সমাজব্যবস্থায়। শুধুমাত্র কর্মসূত্রে দিনমজুর, জেলে, কলু, কর্মকার প্রভৃতি আপাতভাবে নিম্নশ্রেণির মানুষের সঙ্গে উচ্চবর্ণের মানুষেরা যোগাযোগ রাখত। কাব্যে জোলেখার বিবাহে আনুষ্ঠানিক যে সামাজিক আচার আমরা লক্ষ করি তা হল–

“ব্রাক্ষণে পড়এ বেদ মন্ত্র উপচারি।

কবিত্ব পড়এ ভাই পিঙ্গল বিচারি।।

বহু গুনীগণ সঙ্গে রঙ্গ অভিলাষ।

বিবাহ আনন্দ রংমনেতে উল্লাস।।”

বাংলা সাহিত্যে ‘বিদ্যাসুন্দর’ কাহিনির ঐতিহ্য, প্রবহমানতা, উৎস থেকে গ্রহণ-বর্জন-এর রূপ ও স্বরূপের মৌলিকতা, অভিনবত্ব ও উত্তরাধিকার ইত্যাদি বিষয়ে বিশদ এবং গভীর পর্যবেক্ষণের অপেক্ষা রাখে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে ‘বিদ্যাসুন্দর’ কাব্যধারার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কবি হলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি ভারতচন্দ্র। একথা স্বীকার করেই ‘বিদ্যাসুন্দর’ কাব্যধারার আরও এক খ্যাতনামা কবি কৃষ্ণরাম দাসের কাব্যে সমাজচেতনা কীভাবে ধরা পড়েছে তা আমরা দেখব। বিদ্যা ও সুন্দরের রোমান্টিক প্রণয় তাঁর কাব্যের কাহিনিবস্তু হওয়া সত্ত্বেও যখন তিনি ‘কালিকামঙ্গল’ নামের আশ্রয় নিয়েছেন তখন আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয়না যে, তাঁর কাব্যে মঙ্গলকাব্যের ঐতিহ্য অনুসৃত হবে। তবুও তাঁর কাব্যে মালিনী চরিত্রটি একেবারে বাস্তবানুগ হয়ে উঠেছে। সে রাজপুত্র সুন্দরকে তাঁর উদ্দেশ্যে জেনে নিয়ে বাসা দান করেছে। সুন্দরের কথা মতো ফুল মালা দিয়ে রাজকন্যার

কাছে গেছে কিন্তু বিদ্যার আকুলতা সত্ত্বেও প্রথম দিনেই সে সুন্দরের পরিচয় তাকে জানায়নি। পরে বিদ্যা যখন গোপনে সুন্দরকে নিয়ে আসার কথা বলেন তখন যে সামাজিক বাস্তবতার চিত্র আমরা পাই তা এইরকম–

“না জানিব বাপমায়ে গোপনে আনিবে তায়
ইহা কভু ছাপি নাহি হবে।
বড়গো আমার ভয় যদিগো প্রচার হয়
পরিণামে কিমত করিবে।।
হের শুন বলি আর তাবত থাকিবে ভাল
যাবত না হও গর্ভবতী।
যুকতি ইহার এই কহ নৃপতির ঠাই
বিভাহ দেওক নরপতি।” [৫]

হিন্দুসমাজে কন্যার পতিগৃহে যাত্রার দৃশ্য চিরকালই করুণরসে আর্দ্র। কৃষ্ণরামের কাব্যে বিদ্যার শ্বশুরালয়ে গমনের দৃশ্যটিও অত্যন্ত মানবিক হয়ে উঠেছে। সুন্দর পত্নীসহ দেশে ফিরে যেতে চাইলে প্রথমেই রাজা করজোড়ে রাজচ্ছত্র দান করে সুন্দরকে বীরসিংহপুর থেকে যাওয়ার অনুরোধ করেন। কিন্তু জামাতা তাতেও রাজি না হওয়ায় তখন নানাবিধ যৌতুক দান করে অবশেষে–

“বিদ্যারে করিয়া কোলে ভাসিল নয়ন জলে
অস্থির হইল রাজারানী।
বিদ্যা মোর কোলচাছা দূর দেশে যাবে বাছা
কেমনে রহিব একাকিনী।।
কেমনে বাঁচিব আমি দূরদেশে যাবে তুমি
অভাগীর শূন্য কোল করি
আমি বড় অভাগিনী না দেখিব নন্দিনী

কেমনে থাকিব নিজ পুরী।” [৬]

এ যেন একেবারে বর্তমান সময়ের বাস্তবচিত্র, যা কবি সেই সময়ের সাহিত্যে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

বিবাহ অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান তো ছিলই। পণপ্রথার মতো সামাজিক বাস্তবতার ছবিও ফুটে উঠেছে এই সময়ের কবিদের রচনায়। বিবাহে উপহার হিসেবে জামাইকে বিবিধ দানসামগ্রী দেওয়ার রীতি তৎকালীন সমাজে ছিল। ‘লজ্জাবতী বিবির পুঁথি’ নামক একটি মুসলামানী পুঁথি সাহিত্যে আমরা এরকমই একটি দৃষ্টান্ত পাই। পুঁথিতে আছে–

“মালমাত্তা হাতি ঘোড়া দিল বাদশা জামা জোড়া

দেহেজ ছামানা কত আর।।

পাঁচশত সেফাই নিল শাহজাদা খুশি হইল

চলে মর্দ্দ এলাহি ভাবিয়া।

শাহজাদা আগে যায় সেফাই লস্কর তায়

গেল সবে সহর ছাড়িয়া।।”

সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি বর্তমান সময়ের মতো বিভিন্ন সামাজিক বাস্তবতাকে মধ্যযুগের কবিরা সেই সময়ের সাহিত্যে যেভাবে উপস্থাপন করেছেন তা যেন আজও প্রাসঙ্গিক।

আমরা যদি মুকুন্দের ‘কবিকঙ্কণ চণ্ডী’ কাব্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করি তাহলে সেখানেও দেখব যে, মুকুন্দ দক্ষকন্যা ও হিমালয়কন্যার কাহিনির মধ্য দিয়ে বাঙালির পারিবারিক ও সামাজিক চিত্র তুলে ধরেছেন। কবি যে তাঁর চণ্ডীকাব্যে দেবী মাহাত্ম্যের কাহিনি না লিখে কাব্যকে বাস্তব জীবনরসে ভরিয়ে তুলবেন তারই প্রকৃষ্ট ভূমিকা রচনা করলেন কাব্যের দেবখণ্ডে।

দক্ষ-শিব দ্বন্দ্বের মধ্যে আর্য-অনার্য দ্বন্দ্বের ইঙ্গিত ভারতের প্রাচীন মহাকাব্য মহাভারতে থাকলেও সেখানে শ্বশুর-জামাতার লড়াই স্বাভাবিক রূপ পেয়েছে। কৌলীন্য বজায় রাখার জন্য যখন সমাজ শাসনে বারো বছর বয়সের কন্যাকে পাত্রস্থ করতে হত এবং পাত্রের যোগ্যতার কোন বিচার হত না, তখন অবস্থার বিপাকের শিকার কন্যার পিতা যে কোন সময়েই জামাতাকে আপন করে নিতে পারতেন না। আলোচ্য কাব্যে দক্ষ-শিবের দ্বন্দ্বের মধ্যে আমরা সেই সামাজিকতারই পরিচয় পায়। আবার এই জাতীয় বিবাহ পদ্ধতির ফলে কন্যাটির অবস্থা শ্বশুরগৃহে যে

কীরূপ করুণ হত তার পরিচয় কবি দিয়েছেন। পিতৃগৃহে অনুষ্ঠিত যজ্ঞে নিমন্ত্রিতদেরই আকাশপথে গমন দেখে কন্যাটির চিত্ত উতলা হয়েছে। সেও পিতৃগৃহে যাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়েছে এবং যেভাবে কন্যাটির মনের কথা ব্যক্ত হয়েছে তা যেমন তখনকার সকল বিবাহিতা বালিকা কন্যার মনের কথাকে তুলে ধরেছে, তেমনি তা সকলের মনকেও স্পর্শ করেছে। কবি দেখিয়েছেন–

“চিরদিন আছে আশ জাইব বাপের পাশ

নিবেদন নাঞি করি ডরে।।

সুমঙ্গলসূত্র করে আইলাং তোমার ঘরে

পূর্ণ হইল বৎসর সাত।

দূর কর বিবাদপূরহ মনের সাধ

মাএর রন্ধনে খাব ভাত।।

পর্বত কাননে বসি নাঞি পাট পড়সি

সীমন্তে সিন্দুর দিতে সখী।

এক তিল জথা জাই জুড়াইতে নাঞি ঠাঞি

বিধি মোরে কৈল জন্ম দুঃখী।।” ৭

আঠারো শতকের কবি নওয়াজিস খান রচিত ‘গুলে বকাউলি’ একটি প্রণয়ধর্মী রোমান্টিক আখ্যানকাব্য। তবে অন্যান্য রোমান্টিক কাব্যের তুলনায় ‘গুলে বকাউলি’ কাব্যের কাহিনি অধিক রোমান্সধর্মী। কাব্যটির ঘটনাবলীতে বাস্তবতার অংশ খুব কম, তার কারণ প্রথম থেকেই কাহিনি অলৌকিকতার দিকে ঝুঁকে পড়েছে। তবুও এই কাব্যের কিছু সামাজিক সংস্কৃতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কন্যাসজ্জার যে বিবরণ আমরা ‘লায়লি মজনু’ কাব্যে পাই এই কাব্যেও কন্যাসজ্জার রূপ আমরা পেয়েছি এইভাবে–

“কন্যাকে সাজায় বস্ত্র অলঙ্কার দিয়া।।

প্রথমে কোড়াই কেশ দিয়া চতুর্সম।

বান্ধিল পাটের জাদে খোপা মনোরম।।

তাহাতে মুকুতা ছড়া করিল শোভন।

চন্দ্রিমা উদিত যেন বিদারিয়া ঘন।।

সিথিঁপাতি মধ্যেতে সিন্দুর বিরাজিত।

যেব প্রকাশিত হৈল প্রভাত আদিত্য।।

রত্নের টিকলি বিন্দু ললাটেও শোভা।

বালাচন্দ্রে পাইল কিবা পূর্ণচন্দ্র প্রভা।।”

১৬৪৬ খ্রিস্টাব্দে সৈয়দ আলাওল রচিত ‘পদ্মাবতী’ একটি ইতিহাস আশ্রিত রোমান্টিক প্রেম-কাব্য। হিন্দু-মুসলমান উভয় সমাজেই এই কাব্য সমাদৃত। সুফী মতাবলম্বী ভক্ত কবি মালিক মুহম্মদ জায়সীর ‘পদুমাবৎ’ কাব্যের অনুবাদ হল ‘পদ্মাবতী’ । সিংহল রাজকন্যা ও মেবারের রানী পদ্মাবতী বা পদ্মিনীকে নিয়ে এই কাব্যটি রচিত। আলাওলের কাব্যে বর্ণিত হয়েছে মধ্যযুগের সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার ছবি, যার শীর্ষে আছেন রাজা এবং তাকে কেন্দ্র করে বিরাজ করছে অভিজাত অমাত্যমণ্ডলী এবং তারপরে রয়েছে স্তরে স্তরে সমাজের নানা শ্রেণির মানুষ। সিংহল, চিতোর ও দিল্লী নগরীকে কেন্দ্র করে রাজপ্রাসাদ, দরবার, পরিখা, তোরণ ইত্যাদির চিত্র তৎকালীন সামন্ততান্ত্রিক অভিজাত সমাজের চিত্রকেই স্পষ্ট করে। সিংহল নগরির বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি বলেছেন–

“নগরের বসতি দেখিতে অপরূপ।

তেরছ বর্জিত গৃহ সোপান সুরূপ।।

উচ্চতর মনোহর সুন্দর আবাস।

অমরা নগরে যেন ইন্দ্রের নিবাস।।

কিবা রঙ্ক কিবা রায় ঘরে ঘরে সুখী।

বালবৃদ্ধ যুবক সকল হাস্যমুখী।।” [৮]

এই ধরনের বহু বর্ণনা কাব্যের বিভিন্ন স্থানে থাকলেও একটু লক্ষ করলেই আমরা দেখব যে, সাধারণ দরিদ্র মানুষের কথা এখানে নেই। এর কারণ হিসাবে বলা যায় যে, আলাওল যে সমাজ পারিপার্শ্বিকের মধ্যে অবস্থান করে কাব্য রচনা করেছেন সেখানে অভিজাত ধনি সম্প্রদায়ই প্রধান।

মধ্যযুগের প্রণয়ধর্মী আখ্যানকাব্য থেকে সরে এসে আমরা আসব বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের একেবারে শেষ পর্বে। ১৭৫১ খ্রিস্টাব্দে কবি গঙ্গারাম বিরচিত ‘মহারাষ্ট্র পুরাণ’ ইতিহাস আশ্রিত কাব্যের একটি আদর্শ দলিল। কাব্যটির বিষয়বস্তু হল পূর্ব ভারতের এবং বিশেষ করে বাংলার এক ঐতিহাসিক সংকট। কোনোভাবেই এই কাব্য কোনো দেবতা বা দেবীকে আশ্রয় করেনি। যদিও পুরাণকথার পরম্পরাশ্রিত শৈলীতেই কাব্যটি শুরু হয়েছে, কিন্তু পুরাণ এখানে কেবল বাহ্যিক বিষয় মাত্র। কারো পূজা প্রচারের জন্য এ কাব্য রচিত হয়নি। এই কাব্যের বিষয় হল অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে অর্থাৎ ১৭৪২ থেকে ১৭৪৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বাংলাদেশে মহারাষ্ট্রীয় বর্গিদের অমানুষিক অত্যাচার এবং বাংলার সমাজজীবনে ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি। এই কাব্যের আদ্যপান্ত জুড়ে রয়েছে বর্গি আক্রমণের ভয়াবহ চিত্র। তবুও সমাজজীবনের যা কিছু চিত্র আমাদের কাছে ধরা পড়েছে সে বিষয়ে আমরা আলোচনা করতে পারি।

ইতিহাসের দিকে লক্ষ করলে আমরা দেখব যে এই সময় বাংলায় শাসনকর্তা ছিলেন নবাব আলিবর্দি খাঁ। যদিও নবাবী আমলের আরও কয়েকটি কাব্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কিছু সামাজিক রীতিনীতির কথা রয়েছে সে সম্পর্কে আমরা এর পরেই আলোচনা করার প্রয়াস রাখছি। নবাবী শাসনব্যবস্থা এবং খাজনা আদায় কাজে যে সামাজিকতার চিহ্ন আমরা ‘মহারাষ্ট্র পুরাণ’ কাব্যে লক্ষ করি তা এইরকম–

“আজ্ঞা দিল দেওয়ানকে পত্র পড়িবারে।

পত্র ছাড়িয়া দেওয়ান সুনান রাজারে।।

জবর হইল সুবা বাঙ্গালা সহরে।

দুই বৎসর হইল খাজনা না দেএ তারে।।

আজ্ঞা দিলা বাদসা ফৌজ পাঠাইএ্যা।

চোথাই নেএন জেন জবর করিএ্যা।।” ৯

বর্গিরা বাংলা আক্রমণের ফলে এবং লুঠতরাজের ফলে বাংলার সাধারণ মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় রসদ মেলা ভার হয়ে উঠল। শুধু তাই নয়, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস যখন দুষ্প্রাপ্য হয়ে যায় তখন তার মূল্যও হয় আকাশছোঁয়া। সেই সামাজিক ভয়াবহতার চিহ্ন ধরা পড়েছে আলোচ্য কাব্যে–

“একদিন দুইদিন করি সাত দিন হইল।

চতুর্দ্দিকে বরগীতে রসদ বন্ধ কৈল।।

মুদি বানিঞা জত বরাইতে নারে।

লুটে কাটে মারেছমুতে পাএ জারে।।

বরগীর তরাসে কেহ বাহির না হএ।

চতুর্দ্দিকে বরগীর তরে রসদ না মিলএ।।

চাউল কলাই মটর মুষরি খেসারি।

তেল ঘি আটা চিনি লবণ একসের করি।।

টাকা সের হৈল আনাজ কিনতে নাই পাএ।

ক্ষুদ্র কাঙ্গাল জত মইরা মইরা জাএ।।

গাজা ভাংগ তামাকু না পাএ কিনিতে।

আনাজ নাহি পাওয়া যাএ লাগিল ভাবিতে।।" [১০]

সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির এবং বৃত্তির মানুষের পরিচয় তুলে ধরেছেন গঙ্গারাম তাঁর এই কাব্যে। বর্গির আক্রমণে এবং অকথ্য অত্যাচারে সমাজে বসবাসকারী উচ্চ-নীচ সব শ্রেণির মানুষ প্রাণের তাগিদে ঘর ছেড়ে পালায়। সেই ছবি তুলে ধরতে গিয়েও সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের কথা ভুলে যাননি কবি। তিনি বাস্তবতার সেই চিত্র কবি ফুটিয়ে তুলেছেন এইভাবে–

"তবে সব বরগি গ্রাম লুটিতে লাগিল।

জত গ্রামের লোক সব পলাইল।।

ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পলাএ পুথির ভার লইয়া।

সোনার বাইনা পলায় কত নিক্তি হড়পি লইয়া।।

গন্ধবণিক পলাএ দোকান লইয়া জত।

তামা পিতল লইয়া কাঁসারি পলাএ কত।।

কামার কুমার পলাএ লইয়া চাক নড়ি।

জাউলা মাউছা পলাএ লইয়া জাল দড়ি।।

সঙ্ক বণিক পলাএ করা লইয়া যত।

চতুর্দ্দিকে লোক পলাএ কি বলিব কত।।” ১১

উক্ত কাব্যাংশ থেকেই আমরা বুঝতে পারছি যে কবি বিভিন্ন বৃত্তির মানুষের কথা তুলে ধরেছেন কাব্যমধ্যে।

বর্গিরা বাংলায় এসেছিল লুঠতরাজ চালাতে। সমাজের বিভিন্ন বৃত্তির মানুষের কথা কবি গঙ্গারাম যেমন বলেছেন, তেমনি এও দেখিয়েছেন যে অর্থনৈতিক দিক থেকে যারা উন্নত অর্থাৎ টাকা-পয়সার বিচারে যারা সমাজে প্রভাবশালী তারাই টিকে থাকে। আর অর্থের অভাবে যাদের অন্ন সংস্থান মেলাই দুষ্কর অর্থের অভাবে আক্রমণকারীদের হাতে প্রাণনাশ হবে এতে আর বিচিত্র কী? কবি সেই বাস্তবতাকেই তুলে ধরলেন তাঁর কাব্যে–

“রূপি দেহ বোলে বারে বারে।

রূপি না পাইয়া তবে নাকে জল ভরে।।

এই মতে বরগি কত বিপরীত করে।

টাকা কড়ি না আইলে তারে প্রাণে মারে।।

জার টাকা কড়ি আছে সেই দেয় বরগিরে।

জার টাকা কড়ি নাই সেই প্রাণে মরে।।” ১২

অষ্টাদশ শতাব্দীতে সমাজ সংস্কৃতির রূপ কবি গঙ্গারাম এইভাবে তুলে ধরেছেন তাঁর সাহিত্যের মধ্যে।

যাইহোক আলোচনার একেবারে সিদ্ধান্তে এসে আমরা উপনীত হব। ড. নির্মল দাস তাঁর ‘চর্যাগীতি পরিক্রমা’ গ্রন্থে জানিয়েছেন–

"কাব্যের উদ্দেশ্য সামাজিক ইতিহাস প্রণয়ন না হলেও কাব্য যেহেতু জীবন নির্ভর সেইজন্য কাব্যের মধ্যে জীবনের বাস্তব পটভূমি তথা সমাজ-পরিবেশ সংক্রান্ত তথ্যাদি সন্ধান করলে ইতিহাসবেত্তারা একেবারে বিফল হন না।" [১৩]

সত্যিই তো তাই। আমরা বরাবরই বলে এসেছি যে কবিরা ইতিহাস লেখার জন্য সাহিত্য রচনা করতে বসেননি। একটি দেশ বা রাষ্ট্রের তথা সামাজিক মানুষের জীবনপ্রণালী, রীতিনীতি ইত্যাদি জানার জন্য কবিরা ইতিহাস ঘেঁটে না দেখলেও ইতিহাসবেত্তারা সাহিত্যকে দলিল হিসাবে নির্বাচন করেন এটাই স্বাভাবিক। আসলে সাহিত্য হল যুগ, জগৎ ও জীবনের অনুকৃতি। ভাব, কল্পনা ও অনুভূতির রূপময় অভিব্যক্তি। তাই সাহিত্যিকরা চান বা না চান তাঁদের সাহিত্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সামাজিক চিন্তা চেতনার প্রকাশ ঘটে। আর যে সাহিত্য ইতিহাস আশ্রয়ী বা আখ্যানধর্মী সেখানে সমাজজীবনের আবির্ভাব অবশ্যই স্বীকার্য। সামাজিক বিভিন্ন রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার, পোশাক-পরিচ্ছদ থেকে শুরু করে ধর্ম-কর্ম, সংস্কার-বিশ্বাস ইত্যাদি বিষয় সাহিত্যিকের ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তাঁর সৃষ্টিকর্মে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

টীকা ও তথ্যসূত্র :

১. সতেরো শতকের রাঢ় বাংলার সমাজ ও সাহিত্য, অণিমা মুখোপাধ্যায়, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, পরিমার্জিত সংস্করণ, ২০১৬, পৃষ্ঠা- ২৬

২. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রাচীন ও মধ্যযুগ), ড. দেবেশকুমার আচার্য, ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, পরিমার্জিত সংস্করণ, মে, ২০০৭, পৃষ্ঠা- ৩৫২

৩. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা (স্মারক গ্রন্থ), প্রথম প্রকাশ, আশ্বিন ১৩৮০, পৃষ্ঠা- ১১১-১২

৪. তদেব, পৃষ্ঠা- ১১২

৫. বিদ্যাসুন্দর কাব্যধারা ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার। কেয়া চট্টোপাধ্যায়, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ ২০১২, পৃষ্ঠা- ৩২

৬. তদেব, পৃষ্ঠা- ৩২

৭. কবিকঙ্কণ চণ্ডী, মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড, এলাহাবাদ, ১৯২১, পৃষ্ঠা- ৩৬২

৮. পদ্মাবতী, সৈয়দ আলাওল, আহমদ পাবলিশং হাউস, প্রথম পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ, জুলাই ১৯৯৭ পৃষ্ঠা- ৬৮

৯. বঙ্গে বর্গী, বিহারিলাল সরকার, বারিদবরণ ঘোষ (সম্পাদনা), কারিগর, কারিগর সংস্করণ, ২০১৬, পৃষ্ঠা- ১৩০

১০. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৩৯

১১. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৪১

১২. তদেব,পৃষ্ঠা- ১৪৩

১৩. চর্যাগীতি পরিক্রমা, ড. নির্মল দাস, দে’ জ পাবলিশিং, ২০০৫, পৃষ্ঠা- ৯৫

বিখ্যাত কয়েকজন বাগ্মী ও তাঁদের উল্লেখযোগ্য ভাষণ

তামান্না এমি

অতিথি অধ্যাপক, মিরাণ্ডা হাউস

ভালো বাগ্মী হতে গেলেও বিশেষ কিছু গুণ থাকা দরকার; সহজসরল ভাষায়, শ্রোতার মানসিক অবস্থার কথা মাথায় রেখে, যথাযথ তথ্য প্রদানের মাধ্যমে একটি ভালো বাগ্মিতা জনপ্রিয়তা পেয়ে থাকে। প্রাচীন যুগ থেকেই বক্তৃতার প্রচলন চলে আসছে। গবেষকরা মনে করেন, হাজার বছর আগে মানুষ যখন মনের ভাব প্রকাশের জন্য একে অন্যের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করে, সেই সময় থেকে বক্তৃতার প্রচলন।পাশ্চাত্যের জ্ঞানের ইতিহাসে রেটোরিক বহুল আলোচিত শাস্ত্রধারা। রেটোরিক বলতে বোঝানো হয় বাগ্মিতা ও বিতর্কের শাস্ত্র। সক্রেটিস তার বিভিন্ন বক্তব্যে যে সকল জ্ঞানগর্ভ কথা বলতেন, সেগুলি পরবর্তী কালে ইতিহাসখ্যাত হয়েছে - 'নিজেকে জানো’ , ‘মৃত্যুই হলো মানুষের সর্বাপেক্ষা বড় আশীর্বাদ’ , ‘তুমি কিছুই জানো না–এটা জানাই জ্ঞানের আসল অর্থ’ , মৃত্যুর সময় তিনি বলেন- 'আমি মরছি, তুমি বেঁচে থাকবে।'কোনটি বেশি ভালো, তা কেবল ঈশ্বরই জানেন।' সক্রেটিস তাঁর বক্তৃতায়- দর্শনের কথা বলতেন, সরকারের সমালোচনা করতেন। তিনি সমাজকে বিপথে চালিত করছিলেন সেই অপরাধে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় খ্রিষ্টপূর্ব ৩৯৯ সালে। গ্রিক ইতিহাসে বিতর্কের প্রক্রিয়ায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিরোধী তাত্ত্বিক ছিলেন প্লেটো। তিনি বাচন দক্ষতাকে সম্পূর্ণ রূপে নস্যাৎ করে দিয়েছেন, তাঁর 'Gorgias' শীর্ষক ডায়লগে। বাগ্মিতা নিয়ে যাঁরা আলোচনা করতেন তাঁরা গণতন্ত্রের সঙ্গে বাগ্মিতার সম্পর্কের দিকটি উল্লেখ বা আলোচনা করেছেন। এ ক্ষেত্রে অ্যারিস্টটল লক্ষ্য করেছিলেন জ্ঞানী ব্যক্তি এবং গণসভার পার্থক্যের কথা। এথেন্সে মূলত দুটি প্রতিষ্ঠানে বক্তৃতা কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করতো । একটি আদালত এবং অপরটি গণসভা। অ্যারিস্টটলের প্লেটোর দর্শন নিয়ে মতান্তর থাকায়, তিনি নিজে একটি ভিন্ন প্রতিষ্ঠান

স্থাপন করেন। তিনি তাঁর নিজস্ব দর্শন প্রচার করতেন। তিনি দিনে তার ছাত্রদের জন্য ও রাত্রে এথেন্সের সাধারণ জ্ঞানপিপাসু জনগণের জন্য বক্তৃতা দিতেন। অ্যারিস্টটল জ্ঞানী ব্যক্তির বক্তৃতা এবং গণসভায় উপযুক্ত বক্তৃতার মধ্যে যে পার্থক্য করেছেন তার পূর্বসূত্র যেন ইলিয়াডে রয়ে গেছে। তিনি সর্বদা বাগ্মিতাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর মতে, বাগ্মিতা হল বিভিন্ন ধরনের যুক্তি বিন্যাসকে ব্যবহার করে জনমতকে প্রভাবিত করার প্রক্রিয়া। তিনি মনে করতেন, রেটোরিকের মৌলিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রমাণ করার একটি প্রক্রিয়া ।

প্রাচীন রোমের বিখ্যাত রাজনীতিবিদ মার্কাস সিসেরো বিখ্যাত বাগ্মী ছিলেন। সাধারণ জনগণকে প্রভাবিত করতে তিনি নিয়মিত সভা-জমায়েতে বক্তৃতা রাখতেন। বাগ্মিতা দিয়ে তিনি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। সেই সময়ে তিনি শ্রেষ্ঠ 'বাগ্মী' হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। আদালতে তাঁর বক্তৃতা মন্ত্রমুগ্ধের মতোই শুনতেন জুরিরা। অনেক ইতিহাসবিদের মনে করেন,পৃথিবীর ইতিহাসে তিনিই অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাগ্মী। বাগ্মী হিসেবে তিনি খ্যাতির শিখরে পৌঁছেছিলেন, তাঁর নাম থেকেই ইংরেজি শব্দ 'সিসেরোনিয়ান' এর উৎপত্তি, যার অর্থ বাগ্মিতা। সিসেরো তাঁর বক্তৃতা লিখে রাখতেন, ফলে পরবর্তীকালে সেগুলি আমরা প্রবন্ধকারে পেয়েছি।

সিসেরোর বক্তৃতাগুলো আইনজীবিদের জন্য অর্থবহ ভূমিকা পালন করে।

তিনি আরও বলেন, 'মানুষ তাকে স্বেচ্ছায় অনুসরণ করত। কারণ দারুণ প্রতিকূল সময়েও তার কাছে সঠিক উত্তর ছিল।' গবেষকরা তার নানান সময়ে দেওয়া বক্তৃতাগুলোর অর্থ বিশ্লেষণ করে দেখেছেন-

১। হিটলার যে বিষয়ে বক্তব্য রাখতেন, সেই বিষয় সম্পর্কে তার মনে স্বচ্ছ ধারণা থাকতো । তিনি সেই বিষয় নিয়ে প্রচুর অনুশীলন করতেন।

২. একটি বক্তৃতা তৈরি করতে হিটলার প্রচুর পরিশ্রম করতেন।

হিটলারের মন্ত্রী জোসেফ গোয়েবেলস ডায়েরিতে থেকে আমরা জানতে পারি- হিটলার যে বিষয়ে বলবেন, সেই বিষয় নিয়ে প্রথমে ভাল মতো জ্ঞাত হতেন। এবং তিনি তাঁর নিজের বক্তৃতা নিজেই লিখতেন, কমপক্ষে পাঁচবার পর্যন্ত লিখিত বক্তৃতাসংশোধন করতেন। তিনি কারও লিখিত বক্তৃতার উপর ভরসা করতেন না। তিনি প্রতিদিন গভীর রাত পর্যন্ত তার সেক্রেটারিদেরনিয়ে বক্তৃতা লিখতেন। লিখিত বক্তৃতাগুলো খুব মনযোগের সাথে সংশোধন করা হতো।

৩. বক্তৃতায় কণ্ঠস্বর বিশেষ ভুমিকা রাখে। হিটলারের কণ্ঠস্বর ছিল মুগ্ধকর । সম্মোহনীয় কণ্ঠস্বর দিয়ে হিটলার শ্রোতাকে আকৃষ্ট করতেন। তিনি আকর্ষণীয় ও জোরালো কণ্ঠস্বরের অধিকারী ছিলেন। শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে তার বক্তৃতা শুনতেন।

৪. হিটলার বক্তৃতা চলাকালীন হাতের ব্যবহার করতেন। সুকণ্ঠ, সুলিখিত বক্তৃতা ছাড়াও তিনি মানুষকে সম্মোহিত করতে, তারহাতের এই কৌশল রপ্ত করেছিলেন। বক্তৃতা চলাকালীন তিনি হাতের বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি করতেন। হাতের কৌশল রপ্ত করার জন্যতিনি দীর্ঘসময় ব্যয় করেছিলেন। হিটলারের আলোকচিত্রকর তার অনুশীলনের ছবি তুলতেন। হিটলার সেই ছবি দেখে তারকৌশলের ভুল ত্রুটি ঠিক করতেন।

বিখ্যাত কিছু বক্তৃতা

মোহাম্মদের (সাঃ) বিদায় হজের বক্তৃতা

হে আমার প্রভু! আমি আমার পয়গাম (প্রস্তাব) পৌঁছে দিয়েছি, আমার কাজ সম্পূর্ণ করেছি

হযরত মোহাম্মদের ((সাঃ) বিদায় হজের বক্তৃতা খুব তাৎপর্যপূর্ণ। ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে হজ পালনের সময় ঐতিহাসিক আরাফাতময়দানে ইসলাম ধর্মের সর্বশেষ নবী বা ঈশ্বরের দূত এই বক্তৃতা দিয়েছিলেন। আলোচ্য বক্তৃতাটি উনার দেওয়া শেষ বক্তৃতা।শ্রোতা হিসাবে সেদিন প্রায় সোয়া লাখ মানুষ আরাফাত পর্বতের পাদদেশে দাঁড়িয়ে বক্তৃতাটি শুনেছিলেন।

আরববাসী মোহাম্মদের ((সাঃ) কথায় উদ্বুদ্ধ হয়ে, দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। মোহাম্মদ (সাঃ) সেই সময় অসুস্থ হয়েপড়েন, তিনি উপলব্ধি করেন, তাঁর কাজ সাঙ্গ হয়েছে, অন্ধকার যুগের অবসান হয়েছ। তাঁর অন্তিম সময় প্রায় আসন্ন। সেইকারণে তিনি বিদায় হজে বক্তৃতার দেন।

তিনি বক্তৃতার প্রারম্ভে বলেন, ‘হে মানবসমূহ, মনযোগ সহকারে আমার কথা শোনো। হয়তো এ বছরের পর আমি আরতোমাদের সঙ্গে এইভাবে যোগ দিতে পারব না। জানিনা আবার দেখা হবে কিনা! তিনি বলেন, ‘হে মানুষ সম্প্রদায়, তোমরা ভুলে যেও না, তোমাদের স্ত্রীদের ওপর যেমন তোমাদের অধিকার রয়েছে, তেমনি তোমাদের স্ত্রীদেরও তোমাদের ওপর অধিকারআছে। তাদের সম্মান করো, ভালোবাসো।’ এই বক্তৃতাতে তিনি সুদকে অবৈধ বলে ঘোষণা করে দেন, ফলে এই বক্তৃতাগুরুত্ববহন করে। তিনি প্রতিশোধ নেওয়া হারাম করে দেন। তিনি বলেন, ‘অন্ধকার যুগের মত খুন-জখম করা যাবে না, আজথেকে সমস্তরকম অন্যায় কাজ থেকে দূরে থাকবে। ভৃত্যদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করার নির্দেশ দেন। সব মুসলিম ভাইভাই, তাইভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ হতে বলেন। তিনি এরপরে এই বক্তৃতার অত্যন্ত জরুরি কথা ঘোষণা করেন, ‘তোমাদের কাছে আরকোনদিন আমার পর ঈশ্বরের দূত আসবে না, আমি ঈশ্বরের প্রেরিত শেষ দূত।'

ইসলাম ধর্মে মানুষের সঙ্গে মানুষের কোনো ভেদাভেদ নেই। এরপরে তিনি বলেন, সর্বদা মনে রাখবে, ‘ইসলাম ধর্মে জাতিভেদপ্রথা নেই, শ্রেণিভেদ ও বর্ণবৈষম্যও নেই। কোন ধরনের কুসংস্কার কে প্রশয় দেবে না। ইসলাম ধর্মে কুসংস্কারের কোন জায়গা নেই।

এই বক্তৃতায় ইসলাম ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ কিছু নিয়মাবলী মোহাম্মদ (সাঃ) তুলে ধরেছিলেন। মুসলিম জাতির করনীয়, বর্জনীয়কাজের তালিকা তিনি প্রকাশ করেছিলেন। এই ঐতিহাসিক বক্তৃতায় আদেশ, উপদেশ, নির্দেশ ক্রমানুযায়ী উচ্চারিত হয়েছে। এইবক্তৃতা দেওয়ার সময় প্রতিটি বাক্য শেষে মোহাম্মদ (সাঃ) বিরতি নিয়েছেন, সেই সময় উমাইয়া রাবিয়া নাম্নী একটি ছেলে উচ্চস্বরে বক্তৃতার পুনরাবৃত্তি করেছেন, যেন উপস্থিত শ্রোতা প্রতিটি বাক্য শুনতে পান।

বিদায়ী বক্তৃতাটি মোহাম্মদ (সাঃ) এর অন্যান্য বক্তৃতার তুলনায় সাধারণ হলেও, এই বক্তৃতার গভীর তাৎপর্য ছিল। বক্তৃতারসমাপ্তির সময় আবেগে উদ্বেলিত শ্রোতার দিকে তাকিয়ে মোহাম্মদ (সাঃ) নিজেও আবেগপ্রবণ হয়ে ঘোষনা করেন, ‘হে আমারপ্রভু! আমি আমার পয়গাম (প্রস্তাব) পৌঁছে দিয়েছি, আমার কাজ সম্পূর্ণ করেছি।’ এরপর উক্ত সমাবেশের বিপুল সংখ্যকজনগণ

সমস্বরে বলেন, ‘হ্যাঁ, আল্লাহর প্রেরিত দূত ,আপনি আপনার দায়িত্ব পালন করেছেন।’

পেট্রিক হেনরি

‘আমাকে স্বাধীনতা দাও, নয়তো মৃত্যু’

১৭৭৫ সালের ২৩ মার্চ ভার্জিনিয়া রাজ্যের নেতা পেট্রিক হেনরি স্বাধীনতার ডাক দেন।

তিনি এই বক্তৃতায় বলেন – ‘আমাকে স্বাধীনতা দাও, নয়তো মৃত্যু’ । যুদ্ধের ডাক দেওয়ার আগে তিনি বলেন – দীর্ঘসময় শান্তিবজায় রাখার বৃথা চেষ্টা করেছি, কোন কিছু কাজ করেনি, কাজ করছে না এবং ভবিষ্যতেও করবে না। তাই তিনি জানানসমাধানের একটাই পথ দেখতে পাচ্ছি – তা হলো যুদ্ধ করা, সেই যুদ্ধ আজ, এখন থেকে শুরু করতে হবে। কারণ যুদ্ধ কে এড়িয়েযাবার কোনো পথ নেই। তাই যুদ্ধকে সাহসিকতার সঙ্গে আলিঙ্গন করতে হবে। এই যুদ্ধে যদি আমরা পিছিয়ে যাই, তাহলেদাসত্বকে মেনে নিতে হবে। এরপর হেনরি পরাধীনতা কে শিকলের সঙ্গে তুলনা করে বলেন, আজ এই শিকলে মরিচা ধরে গেছে।শিকলের ঝনঝন শব্দ শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। তিনি আসন্ন যুদ্ধের প্রতি ইঙ্গিত দিয়ে দুবার উচ্চারণ করেন, ‘তাকে আসতে দাও, তাকে আসতে দাও।’

তিনি জানান, ‘আমাদের ভাইরা লড়াই শুরু করেছে। সুতরাং অলস হয়ে বসে থাকার সময় নেই। ভদ্রতাদেখানোর সময় শেষ। এরপর তিনি বক্তৃতায় ঐতিহাসিক প্রশ্ন উত্থাপন করেন, ‘জীবন কি এতই প্রিয় আর শান্তি কী এতই মধুর, শিকল এবং দাসত্বের দামে তাকে কিনতে হবে?’ এ প্রশ্নের স্বঘোষিত উত্তরই দিয়ে তিনি বলেন ‘আমি জানি না সবাই কোন পথবেছে নেবে। কিন্তু আমি আমার নিজের ক্ষেত্রে বলব– ‘ আমাকে স্বাধীনতা দাও, নয়তো মৃত্যু। ’ পেট্রিক হেনরির এই কথা শোনারপর উক্ত জনসভার শ্রোতারা আবেগে উদ্বেলিত হয়ে পড়েন।

এলিজাবেথ ক্যাডি স্ট্যান্টন

নারীর কণ্ঠে আজ তাই একটি কথাই সোচ্চার হয়ে উঠেছে-'অধিকার।'

যখন দাসত্ব প্রথার বিরুদ্ধে ইউরোপে আন্দোলন চলছিল সেই সময় নিউ ইয়র্কের মেনেকা ফলস গ্রামে আধুনিক নারী অধিকারআন্দোলন শুরু হয়েছিল। সেই সময় এলিজাবেথ পড়াশোনার অনুমতি পেয়েছিলেন। রক্ষণশীল পরিবারে বড় হলেও তিনিছেলেদের স্কুলে গণিতশাস্ত্র ও ধ্রুপদী সাহিত্য পড়তেন। তাঁর বাবার আইন সংক্রান্ত ফাইলগুলোই তিনি সেইসময় পড়তেন। তাঁরবাবার আইনের বই পড়ে, এবং তার বাবার কাছে আইনি পরামর্শ নিতে যে নারীরা আসতেন তাদের অভিযোগ শুনে, এলিজাবেথসমাজে মেয়েদের দুরবস্থার কথা জানতে পারেন। আইনের বই ব্ল্যাকস্টোন তিনি মন দিয়ে পড়েন। এই বইটি পড়ে তিনি বুঝতেপারেন, বিবাহ বন্ধনের ফলে স্বামী-স্ত্রী আইনত একটি সত্তায় পরিণত হয়। স্বামীর কর্তৃত্ব মেনে চলতে হয়, মহিলাদের স্বাধীনসত্তা বলে কিছু থাকে না। এলিজাবেথের স্বামী দাসত্বপ্রথা উচ্ছেদের একজন সমর্থক ছিলেন। এলিজাবেথ একবার তাঁর স্বামীরসঙ্গে লন্ডনে অনুষ্ঠিত দাসত্বপ্রথা বিলোপ সাধনের একটি সম্মেলনে যান। সেখানে গিয়ে তিনি লক্ষ্য করেন সেই সম্মেলনেমেয়েদের কোন স্থান নেই! এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বিখ্যাত কোয়েকার প্রচারক লুক্রেসিয়া কার্বন মাট। এই দুজন নারীরপক্ষে সেদিনের সম্মেলনের বৈষম্য মেনে নেওয়া কষ্টকর হয়েছিল। এই অপমান তাদের কে মহৎ এক কাজের জন্য উদ্বুদ্ধ করেছিল। নারীর অধিকার নিয়ে তাঁরা আন্দোলন শুরু করেন। ১৮৪০ সালের জুলাই মাসে তাঁরা সেনেকা কালস গ্রামে একটিসম্মেলন করেন। মাত্র দুশো জন সাহসী নারী ও পুরুষ উক্ত সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। সেই সম্মেলনে এলিজাবেথ 'নারীরঅধিকার' নিয়ে একটি বক্তৃতা করেন। বক্তৃতায় তিনি গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়ে আলোকপাত করেন। তিনি জানান, আমাদেরসামজিক জীবনে অনেক সমস্যা রয়েছে, আমাদের রাজনৈতিক অধিকার নেই! পুরুষদের মতো আমরা বিধানসভায় আবেদনকরতে পারিনা। আমরা স্বাধীন হতে চাই। তিনি এই বক্তৃতায় মূলত-

ক) স্বাধীনতা খ) সাম্যতা গ) মর্যাদা ঘ) ভোটাধিকার ঙ) সমানাধিকার কথা বলেছেন। তিনি স্পষ্ট ভাষায় তার বক্তৃতায়জানিয়েছিলেন-নারীকে তার চিরন্তন অধিকার থেকে কিছুতেই কেউ বঞ্চিত করতে পারবে না। নারীর কণ্ঠে আজ তাই একটিকথাই সোচ্চার হয়ে উঠেছে-'অধিকার।'

আব্রাহাম লিঙ্কন

‘জনগণের সরকার, জনগণের দ্বারা সরকার এবং জনগণের জন্য সরকার’

যুক্তরাষ্ট্রের পেনসেলভেনিয়ায় গেটিসবার্গ ১৮৬৩ সালে গৃহযুদ্ধে প্রায় আট হাজার মানুষ মারা যান। তাঁদের স্মরণে এই যুদ্ধের চারমাস পরে একটি স্মরণ সভার আয়োজন করা হয়। এই সভার মূল বক্তা ছিলেন অ্যাডওয়ার্ড এভার্ট, তিনি প্রায় ঘণ্টা দুয়েকবক্তৃতা করেন। লিঙ্কন মাত্র তিন মিনিটে ২৭২ শব্দের একটি বক্তৃতা দেন। এই ঐতিহাসিক বক্তৃতা দিয়ে লিঙ্কন অমর বক্তারস্বীকৃতি পেয়েছেন। এই বক্তৃতার শুরুতে তিনি স্মরণ করেন যাঁরা ৪৭ বছর আগে স্বাধীনতাসংগ্রাম করছেন তাঁদের, এরপর গৃহযুদ্ধেবিপুল পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে সেই প্রসঙ্গে বলেন। তিনি বক্তৃতার শেষে বলেন– ‘জনগণের সরকার, জনগণের দ্বারা সরকার এবংজনগণের জন্য সরকার পৃথিবী থেকে কখনো হারিয়ে যাবে না।’ বিশেষজ্ঞরা মনে করেন শেষের এই লাইনটি গণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠসংজ্ঞা। এই বক্তৃতা শোনার পর শ্রোতারা আবেগে উদ্বেলিত হয়ে পড়েন। শ্রোতারা হাততালি দিতেও ভুলে যান। এই বক্তৃতা শুনেঅ্যাডওয়ার্ড এভার্ট আক্ষেপ করে বলেন, আমি যদি আমার ঘণ্টা দুয়েকের বক্তৃতায় লিংকনের তিন মিনিটের বক্তৃতার মূল কথার কাছাকাছি কিছু বলতে পারতাম!

কেবল পুরুষ নয়

সুজান বি. অ্যান্থনি

যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটসে সুজান বি. অ্যান্থনি বেড়ে উঠেছেন। নিউ ইয়র্কের রচেস্টারে তিনি শিক্ষকতা করতেন। সেইসময় তিনি অবাক হয়ে যান একটি বিষয় লক্ষ্য করে। পুরুষ শিক্ষকরা প্রতি মাসে ১০ ডলার আয় করেন। অপরদিকে নারীদের জন্য বরাদ্দমাত্র ২ দশমিক ৫০ ডলার। সেই সময় থেকে সুজান নারীর অধিকার সচেতন হয়ে ওঠেন। তিনি ১৮৫৩ সালে উইমেন্স প্রোপার্টিরাইট বা নারীর সম্পত্তির অধিকার নিয়ে একটি ক্যাম্পেইন করেন।

সুজান বুঝতে পেরেছিলেন, নারীদের ব্যাপারে শাসকরা কখনই সচেতন হবেন না। যদি নারীদের ভোটাধিকার প্রচলন হয়, তবেইশাসকরা নারীদের প্রতি নজর দেবেন। সেই কারণে নিজের এই ভাবনাকে বাস্তবায়ন করতে, রাষ্ট্রের একজন নাগরিক হিসেবেস্বীকৃতি ও সম্মান পেতে নারীদের ভোটাধিকার নিয়ে কাজ করা শুরু করেন তিনি ১৯৬৯ সালে জাতীয় নারী ভোটাধিকার সংস্থাপ্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৭২ সালে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে নিয়ম অমান্য করে সুজান এবং তাঁর তিন বোন প্রথম নারী হিসেবে ভোট দেন।এর ফলে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। আদালতে তাকে ১০০ ডলার জরিমানা করা হলে তিনি জরিমানা দিতে অস্বীকার করেন। ১৮৭৩ সালে তাঁর বিখ্যাত বক্তৃতায় তিনি বলেন, 'আমি কোনো অপরাধ করিনি। আমি শুধু আমার অধিকার প্রয়োগ করেছি।' সেই বক্তৃতায় তিনি বলেন, 'কেবলমাত্র পুরুষেরা যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেনি, আমরা সমস্ত মানুষ মিলে যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছি।শুধুমাত্র অর্ধেক জনগোষ্ঠী কিংবা অর্ধেক ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এই প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেনি। নারী-পুরুষ সকলের জন্য গড়েতুলেছি।' প্রায় চার দশক পর সুজানের ভোটাধিকার প্রচারণা সফল হয়। ১৯২০ সালের ২ নভেম্বর মার্কিন নারীরা পুরুষদেররপাশাপাশি ভোট দেওয়ার সমানাধিকার পান। সেই বছর প্রায় আট মিলিয়ন নারী ভোট দেন। এই ভোটাধিকার সংশোধনীনামকরণ করা হয়েছে সুজান বি. অ্যান্থনি সংশোধনী।

স্বামী বিবেকানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দ চিকাগো ধর্ম মহাসভার বাগ্মিতা প্রসঙ্গে নিউইয়র্ক ক্রিটিকে লেখা হয়েছিল- কোন প্রকার নোট প্রস্তুত করে তিনিবক্তৃতা করেন না। কিন্তু নিজ বক্তব্য বিষয়গুলি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করে অপূর্ব কৌশলক ও ঐকান্তিকতা সহকারে তিনিমীমাংসায় উপনীত হন এবং অন্তরের গভীর প্রেরণা তার বাগ্মিতাকে অপূর্ব ভাবে সার্থক করে তোলা হয়েছিল। নিউইয়র্কের শ্রেষ্ঠ পত্রিকায় বিবেকানন্দের বাগ্মিতা প্রসঙ্গে লেখা হয় - ধর্ম মহাসভায় বিবেকানন্দ অবিসংবাদি রূপে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। তার বক্তৃতাশুনে আমরা বুঝতে পারছি যে, এই শিক্ষিত জাতির মধ্যে ধর্মপ্রচারক প্রেরণা করা কত নির্বুদ্ধিতার কাজ।

স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগো ধর্ম মহাসভায় মোট ছ'টি বক্তৃতা দিয়েছিলেন-

- অভ্যর্থনার উত্তর - (১১ /৯/১৮৯৩)
- ধর্মীয় ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বভাব- (১৫/৯/১৮৯৩)
- হিন্দুধর্ম - (১৯/৯/১৮৯৩)

- খ্রীষ্টানগণ ভারতের জন্য কি করিতে পারেন? - (২০/৯/১৮৯৩)

- বৌদ্ধধর্মের সহিত হিন্দুধর্মের সম্বন্ধ - (২৬/৯/১৮৯৩)

- বিদায় - (২৭/৯/১৮৯৩)

১১ সেপ্টেম্বর, **১৮৯৩** , শিকাগোতে প্রথম বিশ্ব ধর্ম মহাসম্মেলন হয়েছিল। সেই মহাসম্মেলনে বিবেকানন্দ সম্বোধন করেছিলেন- "হে আমার আমেরিকাবাসী ভগিনী ও ভ্রাতাগণ" ! এই সম্বোধন শুনে শ্রোতারা মুগ্ধ হয়ে, করতালি দিতে শুরু করেন। বিবেকানন্দকোন লিখিত নোট ছাড়া, সাবলীল ভাবে এই সংক্ষিপ্ত বক্তৃতাটি পেশ করেন। 'অভ্যর্থনার উত্তর' শীর্ষক এই বক্তৃতায়, বিবেকানন্দ হিন্দুধর্মের পরমতসহিষ্ণুতার কথা বলেছিলেন। 'শিবমহিমাস্তোত্র' ও গীতা'র উল্লেখ করে তিনি বলেছিলেন, "সবমানুষই সেই এক ঈশ্বরের পথে চলেছে"। এই বক্তৃতায় সাম্প্রদায়িকতা, গোঁড়ামি এবং এগুলির ভয়াবহ ফলস্বরূপ ধর্মোন্মত্ততা'রবিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন।

১৫ সেপ্টেম্বরের বক্তৃতায় বিষয় ছিল, ধর্মীয় ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বভাব। আলোচ্য বক্তৃতায় ছোট একটি গল্প উপস্থাপন করেছিলেন।সাগরতীরের ব্যাঙকে কুয়োর ব্যাঙের সেই বিখ্যাত প্রশ্ন 'সমুদ্র? সে কত বড়? তা কি আমার এই কুয়োর মতো বড়?' বিবেকানন্দসুন্দর ভাবে এই গল্পের বিশ্লেষণ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন -"হে ভ্রাতৃগণ, এইরূপ সংকীর্ণভাবই আমাদের মতভেদের কারণ।আমি একজন হিন্দু। আমি আমার নিজের ক্ষুদ্র কূপে বসিয়া আছি এবং সেটিকেই সমগ্র জগৎ বলিয়া মনে করিতেছি! খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী তাঁহার নিজের ক্ষুদ্র কূপে বসিয়া আছেন এবং সেটিকেই সমগ্র জগৎ মনে করিতেছেন! মুসলমানও নিজের ক্ষুদ্র কূপেবসিয়া আছেন এবং সেটিকেই সমগ্র জগৎ মনে করিতেছেন! হে আমেরিকাবাসীগণ, আপনারা যে আমাদের জগতের এই ক্ষুদ্রজগৎগুলির বেড়া ভাঙিবার জন্য বিশেষ যত্নশীল হইয়াছেন, সেজন্য আপনাদের ধন্যবাদ দিতে হবে। আশা করি, ভবিষ্যতে ঈশ্বরআপনাদের এই মহৎ উদ্দেশ্য-সম্পাদনে সহায়তা করিবেন।"

স্বামী বিবেকানন্দ **১৯** সেপ্টেম্বরে ধর্ম মহাসভায় 'হিন্দুধর্ম' সম্পর্কে একটি লিখিত বক্তৃতা পাঠ করেন। এই বক্তৃতাটি এইসম্মেলনের দীর্ঘতম বক্তৃতা ছিল। আলোচ্য বক্তৃতায় প্রথম ভাগে তিনি হিন্দুধর্ম ও দর্শনের বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন, এবংতারপর, বেদান্তের মহোচ্চ আধ্যাত্মিক ভাব, বেদান্ত জ্ঞান, নিম্নস্তরের মূর্তিপূজা, বৌদ্ধদের আজ্ঞেয়বাদ, জৈনদের নিরীশ্বরবাদ নিয়েবলেন। শেষ ভাগে ভারতের খ্রিস্টান পাদ্রিরা হিন্দুধর্মকে যে 'বহু-ঈশ্বরবাদী ধর্ম' অপবাদ দিয়েছিলেন, সেই বিষয় নিয়ে যুক্তিপূর্ণআলোচনা করেন, এবং এই ধরনের নিন্দাবাদকে তিনি ধর্মোন্মত্ততা বলে চিহ্নিত করেন।

২০ সেপ্টেম্বর বক্তৃতায় স্বামী বিবেকানন্দ বলেন, "ক্ষুধার্ত মানুষকে ধর্মের কথা শোনানো বা দর্শনশাস্ত্র শেখানো, তাহাকে অপমানকরা।" এই বক্তৃতায় তিনি ভারতবাসীর সঙ্গে খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের সম্পর্ক বিষয়ে আলোচনা করেন। তিনি এই বক্তৃতায় প্রশ্নউত্থাপন করে জানতে চাইলেন, 'খ্রীষ্টানগণ ভারতের জন্য কি করিতে পারেন?' পূর্ব বক্তৃতার সূত্র ধরে তিনি খ্রিস্টান ধর্মযাজকদেরকাছে তিনি এই বার্তা পৌঁছে দিলেন- ‘ভারতে ধর্মের অভাব নেই, শুধু ব্রিটিশ শাসনে ভারতের প্রধান অভাব অন্নের’।

২৬ সেপ্টেম্বর 'বৌদ্ধধর্মের সহিত হিন্দুধর্মের সম্বন্ধ' বক্তৃতায় হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্মের সম্পর্কের দিকটি তুলে ধরেন। এই বক্তৃতাথেকে জানা যায়- অতীতে হিন্দু ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্মের সুসম্পর্ক ছিল। কিন্তু বৌদ্ধরা একসময় হিন্দুদের থেকে নিজেদের সম্পর্কবিচ্ছিন্ন করেছিল। তার ফলাফল যে ভাল হয়নি বিবেকানন্দের বক্তব্য থেকে সে বিষয় জানা যায়।

বিবেকানন্দ হিন্দুধর্মের সঙ্গে গৌতম বুদ্ধের প্রচারিত বাণীর সম্পর্কে বক্তৃতায় আলোচনা করেন। তিনি বৌদ্ধদের উদ্দেশ্যে বলেন, "হে বৌদ্ধগণ! বৌদ্ধধর্ম ছাড়া হিন্দুধর্ম বাঁচিতে পারে না। হিন্দুধর্ম ছাড়িয়া বৌদ্ধধর্মও বাঁচিতে পারে না। অতএব উপলব্ধি করুন, আমাদের এই বিচ্ছিন্নভাব স্পষ্টই দেখাইয়া দিতেছে যে, ব্রাহ্মণের ধীশক্তি ও দর্শনশাস্ত্রের সাহায্য না লইয়া বৌদ্ধরা দাঁড়াইতে পারেনা এবং ব্রাহ্মণও বৌদ্ধের হৃদয় না পাইলে দাঁড়াইতে পারে না। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণের এই বিচ্ছেদই ভারতবর্ষের অবনতির কারণ।"

২৭ সেপ্টেম্বরের বক্তৃতায়, আমেরিকার শ্রোতারা প্রতিবাদী বিবেকানন্দ কে দেখেছিলেন। বিশ্বধর্ম মহাসভায় সেদিন বিবেকানন্দগর্জে উঠেছিলেন- ধর্মীয় সন্ত্রাস ও মৌলবাদী সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে। তিনি বলেছিলেন, সম্প্রীতি, উদারতাই একমাত্র পথ, যে পথধরে চললে ধর্মীয় সন্ত্রাস ধ্বংস হবে। 'বিদায়' সম্ভাষণেও বিবেকানন্দ তাঁর প্রথম বক্তৃতার সূত্র ধরে আলোচনা করেছিলেন। তিনিসমস্ত ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বক্তৃতায় বলেছিলেন, "যদি কেহ এরূপ স্বপ্ন দেখেন যে অন্যান্য ধর্ম লোপ পাইবে এবং তাঁহার ধর্মইটিকিয়া থাকিবে, তবে তিনি বাস্তবিকই কৃপার পাত্র। তাঁহার জন্য আমি আন্তরিক দুঃখিত। তাঁহাকে আমি স্পষ্টভাবে বলিয়াদিতেছি, তাঁহার ন্যায় ব্যক্তির বাধাপ্রদান সত্ত্বেও শীঘ্রই প্রত্যেক ধর্মের পতাকার উপর লিখিত হইবে। বিবাদ নয়, সহায়তা। বিনাশনয়, পরস্পরের ভাবগ্রহণ। মতবিরোধ নয়, সমন্বয় ও শান্তি চাই এখন।"

সুভাষচন্দ্র বসু

‘তোমরা আমাকে রক্ত দাও’

সুভাষচন্দ্র বসু গুজরাতের হরিপুরায় **১৯৩৮** সালের **১৯** থেকে **২১** ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের **৫১**তম অধিবেশনে যেঐতিহাসিক অভিভাষণ পাঠ করেছিলেন সেই বক্তৃতাটি 'হরিপুরা অভিভাষণ' নামে প্রসিদ্ধ। মূল বক্তৃতাটি বাংলায় অনুবাদকরেন ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। আলোচ্য বক্তৃতায় সাম্রাজ্যবাদীদের উদ্দেশ্যে কোন বিদ্বেষ প্রকাশ করেননি সুভাষচন্দ্র। তাদেরকে তিনি চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন সাম্রাজ্যকে স্বাধীন জাতি সমূহের বন্ধনহীন সঙ্ঘে পরিণত করতে। এই বক্তৃতায় আমরা দেখেছিবামপন্থী শক্তির মনের কথা বলা হয়েছে। এই বক্তৃতায় কর্মসুচী নির্ধারণ করা হয়েছে। তিনি বক্তৃতায় বলেন প্রথম যে সমস্যা নিয়েকাজ করতে হবে সেটি জনসংখ্যা বৃদ্ধি। সম্ভবত ভারতের রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে তিনি প্রথম জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের কথা ব্যক্তকরেছিলেন। এছাড়া তিনি একে একে যে বিষয়গুলি নিয়ে বলেছিলেন সেগুলি হল- জাতীয় পরিকল্পনা, দেশের দারিদ্র্য দূরীকরণ, ভূমিব্যবস্থার ব্যাপক সংস্কার, জমিদারি প্রথা বিলোপ, কৃষিঋণ মুকুব, গ্রামীণ অর্থনীতি মজবুত করতে সস্তা মূলধনের ব্যবস্থা, সমবায় প্রথার বিস্তার, বৈজ্ঞানিক কৃষির মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি, শিল্পায়নের ওপর রাষ্ট্রীয় মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ, দেশেরঅর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ইত্যাদি। শিশির কুমার বসু ও সুগত বসু হরিপুরা ভাষণ সম্পর্কে বলেছেন- “ এই ভাষণে পাওয়াযায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিশ্বব্যাপী সংগঠনের বিবিধ শক্তি ও দুর্বলতম এক অন্তর্ভেদী বিশ্লেষণ ও স্বাধীন ভারতের আর্থ-সামাজিকপুর্নগঠনের একটি সাম্যতন্ত্রী মানচিত্র।”

১৯৪৩ সালের ৪ জুলাই ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘের এক সাধারণ সভায় রাসবিহারী বসু তাঁর ‘আজাদ হিন্দ বাহিনী ’ সুভাষেরহাতে সমর্পণ করেন। সুভাষচন্দ্রকে আজাদ হিন্দ বাহিনীর সভাপতির পদে নিযুক্ত করা হয়। এই সভায় তাঁকে নেতাজি নামেআখ্যা দেওয়া হয়। সুভাষ বসু সভাপতির দায়িত্ব নিয়ে অভিবাদন গ্রহণ করেন। এসময় তিনি বলেন,

‘সহজে স্বাধীনতা আসবে না - আসতে পারে না

আমাদের দাবি, স্বাধীনতার দাবি।

রিক্ত আমি, সর্বহারা আমি, তোমাদের হয়তো আজ

কিছুই দিতে পারবো না। তবে, তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি স্বাধীনতা দেব।’

উইনস্টন চার্চিল

‘দেওয়ার মতো কিছুই নেই আমার। আছে শুধু রক্ত, কষ্ট, অশ্রু আর ঘাম’

ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিলের ঘটনাবহুল জীবন ছিল। তিনি স্কুল জীবনে কোনদিন সাফল্যের মুখ দেখেন নি, সামরিক জীবনের প্রবেশিকা পরীক্ষায় তিনবার বিফল হন। তবে পরবর্তীকালে দেখা যায় তিনি বিখ্যাত ওয়াশিংটন পত্রিকারসার্থক সাংবাদিক হয়েছেন। তিনি সাহিত্য চর্চা করে নোবেল পেয়েছেন। চার্চিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যোগদানকরেছিলেন। সামরিক জীবনে তিনি-ভারত, সুদান, দক্ষিণ আফ্রিকা, কিউবা সহ বিভিন্ন দেশের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। চার্চিলরাজনীতিতে যোগদান করে বিপুল সাফল্য পান। ১৯৪০ থেকে ১৯৪৫ এবং ১৯৫১ থেকে ১৯৫৫ ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রীর পদসামলান চার্চিল। এইসময় তিনি তাঁর প্রায় সমস্ত বক্তৃতায় দুই আঙুল উঁচু করে সিগনেচার সিম্বল 'V' ফর ভিক্টরি অর্থাৎ বিজয়চিহ্ন দেখিয়ে সমগ্র বিশ্বে ব্যাপক ভাবে জনপ্রিয় হয়েছিলেন। সামরিক জীবন এবং রাজনৈতিক জীবনে চার্চিল অসংখ্য বক্তৃতাদিয়েছেন, তবে তাঁর ১৯৪০ সালের ১৩ মে র বক্তৃতাটি অন্যান্য বক্তৃতার থেকে ভিন্ন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯৩৯ সালের ৩ মেইংল্যান্ড জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এই যুদ্ধ ইংল্যান্ডের রাজনীতিতে এক নাটকীয় পরিবর্তন আনে। এমনি একনাটকীয় প্রেক্ষাপটে ১৯৪০ সালের ১২ মে উইনস্টন চার্চিল প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। জনসাধারণ এই সময়ে দুটিকারণে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন- ১) তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নিভাইল চেম্বারলিকে প্রধান মন্ত্রীর পদ থেকে সরিয়ে যুদ্ধবাজ হিসেবে খ্যাতচার্চিলকে প্রধানমন্ত্রীর পদে নিযুক্তকরণ

২) চার্চিল জার্মানির সঙ্গে কোনো আপসে না গিয়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ

১৩ মে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত হবার পর ইংল্যান্ডের হাউস অব কমন্সে চার্চিল বক্তৃতা দেন । বক্তব্যের সূচনায় তিনি তারনিজের এবং যুদ্ধ পরিচালনার জন্য 'ওয়ার ক্যাবিনেট' এর দায়িত্ব গ্রহণের বর্ণনা দেন। এরপর, যুদ্ধ এবং যুদ্ধ প্রস্তুতির সম্পর্কেবিস্তারিত বর্ণনা দেন। অনিবার্য কারণে তিনি দীর্ঘ বক্তৃতা পেশ করতে পারবেন না বলে ক্ষমা চেয়ে নেন। যুদ্ধের জন্য সবারসমর্থন ও সহায়তা কামনা করেন। এরপর তিনি তাঁর বক্তৃতার উচ্চারণ করেন অমোঘ বাণী– এই সরকারে মন্ত্রী হিসেবে যাঁরাশপথ নিয়েছেন আমি তাঁদের এবং মহান সংসদকেও বলছি, 'আমার দেওয়ার মতো কিছুই নেই, আছে শুধু রক্ত, কষ্ট, অশ্রু আরঘাম, আমাদের সামনে অগ্নিপরীক্ষা, আমাদের মাসের পর মাস যুদ্ধ করতে হবে আর কষ্ট সহ্য করতে হবে। তোমরা যদি জিজ্ঞেসকর আমাদের নীতিমালা কি, তাহলে আমি বলব আজ আমাদের একটাই নীতি; জল, স্থল ও আকাশপথে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া, আমাদের সমস্ত সামর্থ্য আর ঈশ্বর-প্রদত্ত শক্তি নিয়ে আমাদের যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে, আমাদের নীতি এটাই, আমাকে যদি প্রশ্ন কর আমাদের লক্ষ্য কি? আমি এক কথায় উত্তর দেব– বিজয়। রাস্তা যতই দীর্ঘ অথবা দুর্গম হোক, বিজয়কেছাড়া আমাদের বাঁচার কোনো রাস্তা নেই।'

মহাত্মা গান্ধী

‘করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে’

তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে। যুদ্ধ শুরু হয়েছে বেশ অনেকদিন, প্রায় সব কিছুই ধ্বংস হয়ে গেছে, মানবসভ্যতা সংকটময়, চারিদিকে যুদ্ধ বিধ্বস্ত পরিস্থিতি, কেউ লড়ছে নিজের অস্তিত্ব রক্ষায়, কেউ বা নিজের দেশকে ভালবেসে, কেউ কেউ কেবলমাত্র দেশজয়ের নেশায় লড়াই করছে, সেইসময় ভারতে দেখা গেল অদ্ভুত এক দৃশ্য !

এমন এক ভয়ানক পরিস্থিতিতে তৎকালীন ব্রিটিশ-শাসিত ভারতবর্ষে দেখা গেল মহাত্মা গান্ধী অহিংসা আন্দোলনের ডাকদিচ্ছেন। ভালোবাসাকে হাতিয়ার করে ব্রিটিশদের ভারত থেকে বিদায় করা এবং ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে এইসংগ্রামের ডাক দিয়েছিলেন মহাত্মা গান্ধী। সেই আন্দোলন ‘ব্রিটিশ তাড়াও ’ বা ‘কুউট ইন্ডিয়া’ আন্দোলন নামে পরিচিত । ১৯৪২ সালের ৮ আগস্ট মহাত্মা বোম্বের গাওলিয়া ট্যাক ময়দানে ব্রিটিশদের ভারত ছেড়ে যেতে বলেন। তিনি এই বক্তৃতায় বলেন ‘করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে’ । এই বক্তৃতাটি ভারত ছাড়ো বা কুইট ইন্ডিয়া বক্তৃতা নামে বিখ্যাত ।

নেলসন ম্যান্ডেলা

‘স্বাধীনতা অর্জনের কোনো সহজ পথ নেই’

কৃষ্ণাঙ্গদের ওপর শ্বেতাঙ্গদের বর্ণবাদী আচরণের বিরুদ্ধে সারাজীবন সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন । আজ তিনি নিপীড়িত, শোষিতসকল মানুষের পথ প্রদর্শক। ম্যান্ডেলা তার সংগ্রামী জীবনে, অনেক বক্তৃতা দিয়েছেন। তার অসাধারণ বক্তৃতা শুনে অসংখ্যসর্বহারা মানুষ উজ্জীবিত হয়েছেন। তাই ম্যান্ডেলা কেবল দক্ষিণ আফ্রিকারই নেতা হিসাবে সীমাবদ্ধ থাকেননি, তিনি সারাপৃথিবীর সংগ্রামী মানুষের প্রতিনিধি। ম্যান্ডেলা তার রাজনৈতিক জীবনে অনেক বক্তৃতা দিয়েছেন। তাঁর প্রায় সব বক্তৃতাগুলোপ্রসিদ্ধ। তবে ১৯৫৩ সালের ২১ সেপ্টেম্বরের বক্তৃতাটি সর্বকালের সেরা বক্তৃতা হিসাবে পরিচিতি পেয়েছে। নেলসন ম্যান্ডেলারবিরুদ্ধে আইনি লড়াই চলার সময়, এই বক্তৃতার গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা পরবর্তী সময় তাঁর কণ্ঠে আবার কখন তাঁর আইনজীবীদেরকণ্ঠে বারংবার শোনা গেছে। ম্যান্ডেলা ২১ সেপ্টেম্বরের এই বক্তৃতা অনেকটা নাটকীয় ভাবে শুরু করেন, তিনি বক্তৃতার শুরুতেজানান, সেই ১৯১২ সাল থেকে কৃষ্ণাঙ্গদের উপর শ্বেতাঙ্গদের নির্যাতন শুরু হয়েছে, এই অত্যাচার নিয়ে মানুষ আলোচনাকরেছেন ঘরে-বাইরে, প্রাদেশিক ও জাতীয় সমাবেশে, ট্রেনে-বাসে, কল-কারখানায়, খেত-খামারে, গ্রামগঞ্জে, শহরে, স্কুলে এবংজেলখানায়। এই বক্তৃতায় ম্যান্ডেলা জনগণকে জানিয়েছিলেন যত বড় বিপদ আসুক

না কেন রাজনৈতিক ভাবে সচেতন থাকতেহবে। এই বক্তৃতায় ম্যান্ডেলা ঘোষণা করেছিলেন -স্বাধীনতা অর্জনের কোন সহজ পথ নেই।

মার্টিন লুথার কিং

‘আমার একটি স্বপ্ন আছে’

১৯৬৩ সালের ২৮ আগস্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন শহরে মার্টিন লুথার কিং একটি বক্তৃতা দেন, সেই বক্তৃতায় শ্রোতাহিসাবে যোগদান করেন কিং-এর সহকর্মী, বেকার যুবক, স্বাধীনতাকামী সাধারণ জনতা, ধর্মীয় নেতা, শ্রমিক নেতা এবং কৃষ্ণাঙ্গনেতারা। লোকারণ্য হয়ে ওঠে ওয়াশিংটন স্মৃতিসৌধ লিংকন স্কোয়ার। মার্টিন লুথার কিং- এই সমাবেশের শেষ বক্তা ছিলেন।তিনি প্রথমে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন স্বাধীনতার জন্য আয়োজিত মার্কিন ইতিহাসের সবচেয়ে বড় সমাবেশে যোগদানের সুযোগপাওয়ার জন্য। এই বক্তৃতায় তিনি তুলে ধরলেন শ্বেতাঙ্গদের বৈষম্যমূলক আচরণ আর কৃষ্ণাঙ্গদের ওপর নির্যাতন ও বঞ্চনারকথা। তিনি বলেন- আমাদের কাছে কোন কিছু প্রাপ্তি নেই ঠিক ততদিন পর্যন্ত, যতদিন নিগ্রোরা পুলিশের অসহনীয় নির্যাতনেরশিকার হবে। ক্লান্ত শ্রান্ত নিগ্রোরা শহরের হোটেল বা মোটেলে বিশ্রামের অধিকার পাবে! যতদিন আমাদের শিশুরা ‘কেবলমাত্রশ্বেতাঙ্গদের জন্য’ লেখা সাইনবোর্ড দেখবে। আমি জানি, তোমরা অনেকেই দূরদূরান্ত থেকে এসেছ, তোমরা কেউ জেলের কুঠরীথেকে, কেউবা পুলিশের টর্চার সেল থেকে এসেছ, তোমরা নিজের ঘরে ফিরে যাও। কিন্তু কাদা জলে ডুবে থেকো না। হয়তো আজবা আগামীকাল আমাদের জন্য সংকটময় সময়, তবুও আমি স্বপ্ন দেখি, আমেরিকার অস্তিত্বে এই স্বপ্নগাঁথা আছে। আমি স্বপ্নদেখি, একদিন এই জাতির ঘুম ভাঙবে, এবং তারা বিশ্বাস করবে, সমস্ত মানুষ জন্মসূত্রে সমান।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

‘এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম’

শেখ মুজিবুর রহমান সেরা বাগ্মী হিসাবে পরিচিত। তিনি ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ঢাকার তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে ঐতিহাসিকবক্তৃতা প্রদান করেন। সেই বক্তৃতায় তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামের ঘোষণা করেন। আলোচ্য

বক্তৃতায় তিনি প্রথমে তুলে ধরেন তারদুঃখভরা হৃদয়ের কথা। কারণ তখন দেশের বিভিন্ন শহরের রাজপথ রক্তে রঞ্জিত, নির্দয় ভাবে পাকিস্তানী সেনারা বাংলাদেশেরমানুষদের হত্যা করে চলেছে। এই বক্তৃতায় তিনি একে একে বর্ণনা করেছেন তাঁর প্রথম থেকে নেওয়া বিভিন্ন কর্মসূচি ও প্রস্তাব।শাসকগোষ্ঠী বাহান্ন সাল থেকে একে একে প্রায় প্রতিটি বছরে যে রক্তপাত ঘটিয়েছে তারও বর্ণনা দিলেন। এই বর্ণনায় তিনিইয়াহিয়া ও ভুট্টোর ষড়যন্ত্রের কথাও ব্যক্ত করেছেন। নিজের অবস্থান ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রিত্ব নয়, জনগণেরঅধিকারই তার একান্ত কাম্য। এই অধিকার আদায়ের জন্য মুজিব হরতাল ও আন্দোলনের ডাক দেন। তিনি নির্দেশ দিয়ে বলেনঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। তিনি বক্তৃতায় দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করেন তাঁর অবর্তমানে আন্দোলন যেন না থামে, সংগ্রাম চালিয়েযেতে হবে, এবং যে কোন মূল্যে দেশের জন্য স্বাধীনতা নিয়ে আসতে হবে। বক্তৃতা শেষে এসে তিনি ঘোষণা করেন — 'এবারেরসংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' এই বক্তৃতা প্রসঙ্গে আরেফিন সিদ্দিকী বলেছেন- "বাংলাদেশের জন্মের প্রাক্কালে বাংলার জনগণের সাথে বাংলাদেশের অবিসংবদিত নেতার সংলাপ এই বক্তৃতা।"

আমদের আলোচনার শুরুতে আমরা বলেছিলাম রেটোরিক পাশ্চাত্যের ইতিহাসে জনপ্রিয় একটি শাস্ত্রধারা। আমাদের মনে প্রশ্নজাগতে পারে রেটোরিক আসলে কি? খুবই সহজে যদি আমরা এই প্রশ্নের উত্তর দিই, তাহলে দেখবো- সাধারণত আমরারেটোরিক বলতে বুঝি কথা বলা বা লেখার একটি কৌশল। এই কৌশলকে অবলম্বন করে ভাষা বা লেখাকে বলিষ্ঠ ভাবেউপস্থাপন করা হয়। রেটোরিক ডিভাইস একজন বক্তার নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য অর্জন করতে সহায়তা করে। রেটোরিক দ্বারা মানুষকেপ্ররোচিত করা হয় বলে রেটোরিককে প্ররোচনা শিল্প বলা হয়। রেটোরিক ডিভাইস বক্তৃতার মধ্যে প্রয়োগ করে বক্তা, শ্রোতারআবেগকে উজ্জীবিত করে তোলে। আমরা আমাদের আলোচনায় মোট বারো জন বাগ্মীর আঠারোটি বক্তৃতার কথা বলেছি।এরমধ্যে এগারোটি রাজনৈতিক বক্তৃতা। সাতটি ধর্মীয় বক্তৃতা। বক্তৃতাগুলির আধেয় বিশ্লেষণ করে দেখা যায় প্রায় সমস্ত বক্তৃতায়রেটোরিক ডিভাইস প্রয়োগ করা হয়েছে। কয়েকটি বক্তৃতা থেকে দেখে নেব, সাধারণ তিনটি রেটোরিক্যাল উপাদান অর্থাৎ- Ethos, Pathos, Logos কি ভাবে বক্তৃতায় প্রয়োগ করা হয়েছে।

সাধারণত বক্তৃতায় ইথোস্ প্রয়োগ করে বক্তৃতায় বিশ্বাসস্থাপন করা হয়। শ্রোতার সঙ্গে বক্তার একটি যোগসূত্র তৈরি হয়। এইরীতিতে সর্বনামের ব্যবহার বেশি হয়, তবে বাক্য সহজ, সাবলীল থাকে। বক্তা তাঁর বক্তৃতাকে প্রাণবন্ত করে তুলতে এই রীতিরআশ্রয় নেন। মার্টিন লুথার কিং-এর 'আই হ্যাভ আ ড্রিম' বক্তৃতায় আমরা দেখছি তিনি বলছেন- "যতদিন আমাদের শিশুরা 'কেবলমাত্র শ্বেতাঙ্গদের জন্য' লেখা সাইনবোর্ড দেখবে। আমি জানি, তোমরা অনেকেই দূরদূরান্ত থেকে এসেছ, তোমরা কেউজেলের কুঠরী থেকে, কেউবা পুলিশের টর্চার সেল থেকে এসেছ, তোমরা নিজের ঘরে ফিরে যাও। কিন্তু কাদা জলে ডুবে থেকো না।হয়তো আজ বা আগামীকাল

আমাদের জন্য সংকটময় সময়, তবুও আমি স্বপ্ন দেখি, আমেরিকার অস্তিত্বে এই স্বপ্নগাঁথা আছে।আমি স্বপ্ন দেখি, একদিন এই জাতির ঘুম ভাঙবে, এবং তারা বিশ্বাস করবে, সমস্ত মানুষ জন্মসূত্রে সমান।”   অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গেকিং এই বক্তৃতায় ইথোসের প্রয়োগ করেছেন। আবার আমরা মুজিবের ৭ই মার্চের বক্তৃতায় লক্ষ্য করেছি-তিনি বক্তৃতায় পুরনোকথা উত্থাপন করে, বক্তৃতাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছেন- “১৯৫২ সালে রক্ত দিয়েছি। ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেওআমরা গদিতে বসতে পারিনি।১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান মার্শাল ল জারি করে ১০ বছর পর্যন্ত আমাদের গোলাম করে রেখেছে। “

বক্তৃতায় প্যাথোস প্রয়োগ করে শ্রোতাদের আবেগে উদ্বেলিত করে তোলা হয়। আমাদের আলোচ্য প্রত্যেকটি ধর্মীয় ও রাজনতিকবক্তৃতায় সুপ্রযুক্ত ভাবে এই রীতির প্রয়োগ ঘটেছে।

মুহাম্মদ (সাঃ) বিদায় হজের বক্তৃতার শেষ ছত্রে এসে বলেছিলেন - ‘হে আমার প্রভু! আমি আমার পয়গাম (প্রস্তাব) পৌঁছে দিয়েছি, আমার কাজ সম্পূর্ণ করেছি।’ এরপর উক্ত সমাবেশের বিপুল সংখ্যক জনগণ আবেগে ভেসে গিয়ে মহম্মদকে প্রত্যুত্তরেসমস্বরে জানিয়েছিলেন- ‘হ্যাঁ, আল্লাহর প্রেরিত দূত ,আপনি আপনার দায়িত্ব পালন করেছেন।’ আবার, সুভাষচন্দ্র বসু বলেছেন- “সহজে স্বাধীনতা আসবে না - আসতে পারে না, আমাদের দাবি, স্বাধীনতার দাবি। রিক্ত আমি, সর্বহারা আমি, তোমাদের হয়তো আজ কিছুই দিতে পারবো না। তবে, তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি স্বাধীনতা দেব।” বক্তৃতায় লোগোসপ্রয়োগ করে, যুক্তি, তথ্য প্রদান করা হয়। বক্তৃতায় তথ্যজ্ঞাপন করে মূল বক্তব্যকে বিশ্বস্ত করে তোলা হয়। নেলসন ম্যান্ডেলা তাঁরবক্তৃতায় জানাচ্ছেন- সেই ১৯১২ সাল থেকে কৃষ্ণাঙ্গদের উপর শ্বেতাঙ্গদের নির্যাতন শুরু হয়েছে, এই অত্যাচার নিয়ে মানুষআলোচনা করেছেন ঘরে-বাইরে, প্রাদেশিক ও জাতীয় সমাবেশে, ট্রেনে-বাসে, কল-কারখানায়, খেত-খামারে, গ্রামগঞ্জে, শহরে, স্কুলে এবং জেলখানায়। “

অতীতের জনপ্রিয় বক্তৃতাগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, যে সমস্ত বক্তৃতায় মানুষের স্বাধীনতা, অধিকার, গণতন্ত্র, ঐক্য, সাম্যরআখ্যান পাওয়া যায়, সেই সকল বক্তৃতাগুলি সর্বকালের ইতিহাসে সেরা বক্তৃতার শিরোপা পেয়েছে। আমদের আলোচিতবক্তৃতাগুলি বিভিন্ন সময়ে একটি দেশ, কিংবা একটি জাতির ইতিহাসে সামগ্রিক পরিবর্তনের সাক্ষী; তাই আজকের এই যান্ত্রিকযুগেও বক্তৃতার আলোচনা প্রাসঙ্গিক ও প্রয়োজনীয়।

তথ্যসূত্র

১.শিশির কুমার বসু ও সুগত বসু (সম্পা), ২০১০, শ্রী সুভাষচন্দ্র বসু সমগ্র রচনাবলী : অষ্টম খন্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্সপ্রাইভেট লিমিটেড

২) মণি বাগচি (সম্পা), ২০০২, বক্তৃতা শতক, কলকাতাঃ শৈব্য প্রকাশন বিভাগ

৩) স্বামী বিবেকানন্দ, ১৩৭১, স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা: প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড, কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়

৪) এস এম জাকির হুসাইন (সম্পা), ২০০১, বক্তৃতার ব্যকরণ, ঢাকাঃ জ্ঞান প্রকাশনী

৫) নীরদবরণ হাজরা, ১৯৮৫, ভাষণ কোষ, কলকাতাঃ এ মুখার্জি এন্ড কোং প্রাঃ লিঃ

৬)সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, ১৯৬৮, বাঙালির রাষ্ট্রচিন্তা , কলকাতা: সুবর্ণরেখা

৭)https://boishakhionline.com/47502/বিদায়-হজ্জের-ঐতিহাসিক-ভাষণ/

৮)Chakraborty, Amitava, 2008, Rhetorical Figures in South Asia, www.commicationencyclopedia.com

৯) Chakraborty, Amitava, 2005, Rhetorical Figures in contemporary India Literature , Unpublished paper presented in xvi-th Congress International Society for the History of Rhetoric , University of Southern California, USA.

১০)Kamper Dave (Ed), 2014, Fusion Book 2, USAP art Sebarnek Publisher

বৈদ্যুতিন মাধ্যম

১। https://youtu.be/Uu967gl03MU, Published on March 28, 2016

২।https://youtu.be/BvA0J_2ZpIQ Published on March 21, 2008

৩। https://youtu.be/s_LncVnecLA Published on June 4, 2017

8 https://youtube.com/watch?v=vP4iY1TtS3s&feature=share Published on November 7, 2017

૮ https://youtu.be/PDS_BBVfuYQ Published on

2018

রথের রশি: সমাজ পরিবর্তনের এক প্রতিবাদী চিত্র

ডঃ তিলক সরকার
সহকারী অধ্যাপক
জাকির হুসেন দিল্লি কলেজ সান্ধ্য

রবীন্দ্রনাথ রথের রশি নাটকটি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম উৎসব উপলক্ষে তাঁর নামে উৎসর্গ করেন। তিনি গ্রন্থখানি উৎসর্গ করে, শরৎ বাবুকে যা লেখেন, তাতে গ্রন্থটির অন্তর্নিহিত অর্থ প্রকাশ পেয়েছে, তা হল: রথযাত্রার উৎসবে নরনারী সবাই হঠাৎ দেখতে পেল, মহাকালের রথ অচল। মানব সমাজের সকলের চেয়ে বড় দুর্গতি কালের এই গতিহীনতা। মানুষে মানুষে যে সম্বন্ধবন্ধন দেশে দেশে যুগে যুগে প্রসারিত, সেই বন্ধনে এই রথ টানার রশি। সেই বন্ধনে অনেক গ্রন্থি পড়ে গিয়ে মানবসম্বন্ধ অসত্য ও অসমান হয়ে গেছে, তাই চলছে না রথ। এই সম্বন্ধের অসত্য এতোকাল যাদের বিশেষভাবে পীড়িত করেছে, অপমানিত করেছে, মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে, আজ মহাকাল তাদেরই আহ্বান করেছেন তার রথের বাহন রূপে, তাদের অসম্মান ঘুঁচলে তবেই সম্বন্ধের অসাম্য দূর হয়ে রথ সম্মুখের দিকে চলবে। [বিচিত্রা ১৩৩৯ কার্তিক: পৃষ্ঠা ৪৯২]

মোদ্দাকথা মানব সমাজের প্রতীক হল এই রথ। আমাদের এই সমাজ পৃথিবীর সৃষ্টির বহু সময় থেকে চলছে, আর সেই সময় থেকে চলছে মানব সভ্যতার ইতিহাস, এই মানব সভ্যতার নিয়ন্ত্রণ করতো পুরোহিতরা। এরা ছিল মানুষ ও ঈশ্বরের মধ্যকার যোগসূত্র। পুরোহিতরা ছিল সমাজের উচ্চ স্তরে, কেবল মাত্র এস্থান নয়, জ্ঞানের ক্ষেত্রেও তাঁরাই ছিল উঁচুতে। কিন্তু তাদের মধ্যে জ্ঞানের সাধনার পরিবর্তে অহংকারের সৃষ্টি হল কিছুটা। এই জন্যই দূরত্ব সৃষ্টি হল অপর শ্রেণীর সাথে। ফলের সমাজ পরিচালনার দায়িত্ব থেকে বঞ্চিত হল তাঁরা। রবীন্দ্রনাথ নাটকের মধ্যে তাই এক জায়গায় বলেছেন- "সে দিন নেই রে। যেদিন পুরুতের মন্তর পড়া হাতের টানে চলত রথ ওরা ছিল কালের প্রথম বাহন "[পৃষ্ঠা ৫]। ফলে, রাজ্য রক্ষার জন্য সৃষ্টি হল যোদ্ধার দল। এর ফলে প্রমাণিত হল জ্ঞানের চর্চার দ্বারা আর রাজ্য রক্ষা সম্ভব নয়। কিন্তু ঘটনাচক্রে একদিন কালের নিয়মে যোদ্ধারাও রাজশক্তি থেকে সরে গেল। সমাজ কিন্তু ক্রমোমান। সমাজে প্রয়োজনীয় ভোগ্য সামগ্রীর উৎপাদন হবার ফলে ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের সৃষ্টি হল। এরাই সমাজের মাথা। এদের কাছে রাজশক্তি প্রযন্ত মাথা নিচু করতে বাধ্য। নাটকে দ্বিতীয় নাগরিকের কথায় তা স্পষ্ট-

> "এদিকে আবার কোন বুদ্ধিমান বলেছে রাজাকে,- কলিযুগে না চলে শাস্ত্র, না চলে শস্ত্র,
> চলে কেবল স্বর্ণচক্র। তিনি ডাক দিয়েছেন শেঠজিকি।"

কিন্তু এই বণিক শ্রেণীর দ্বারা সমাজ আর চলতে পারছে না। এবারও ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রয়োজন হচ্ছে। তৃতীয় বণিকের কথায় তার প্রমাণ পাওয়া যায়,:

"মন্ত্রী মশায় রশিটানের আরও আড়ষ্ট হয়ে উঠল। আর আমাদের হাতে হল যেন পক্ষাঘাত।"

কিন্তু, সমাজের কথা হল ব্রাহ্মণ- ক্ষত্রিয়- বৈশ্য এই তিন শ্রেণী নিজেদের মধ্যে বোঝা পড়া করে সমাজ নিয়ন্ত্রণ করেও নিজেদের মধ্যে বিন্দুমাত্র সদভাব ছিল না। অথচ এদের বাইরে বহু সংখ্যক মানুষ ছিল, যারা সমাজে বোঝা মাথায় নিয়ে চলে-

"চাষী ক্ষেতে চালাইছে হাল, তাঁতি বসে তাঁত বোনে, জেলে ফেলে জাল; বহুদূর
প্রসারিত এদের বিচিত্র কর্ম ভার, তারি পরে ভর দিয়ে চলিতেছে সমস্ত সংসার।"

এবার সময় এসেছে, এই অত্যাচারিত মানুষের কথা বলার। এর ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে আন্দোলনের স্রোত দেখা দিল। অর্থাৎ, সমাজ পরিবর্তন হবে, সাধারণ মানুষের হাতে সমাজের রথ টানা হবে। সাথে নতুন যুগের সূচনা হল। তাই শ্রমিক দলনীতির মুখে শোনা গেল- "কেমন করে জানা গেল সে, তো কেউ জানে না/ ভোরবেলায় উঠেই সবাই বলবে সবাইকে/ ডাক দিয়েছেন বাবা। কথাটা ছড়িয়ে গেল পাড়ায়,/ পেরিয়ে গেল মাঠ, পেরিয়ে গেল নদী। পাহাড় ডিঙিয়ে গেল খবর/ ডাক দিয়েছেন বাবা।" অর্থাৎ, রবীন্দ্রনাথের কথায় নতুন যুগের সময় চলে এসেছে, সমাজের নিচের মানুষ তথা শূদ্ররা সমাজের রথ টানবে। এই পরিবর্তন বিবেকানন্দও বুঝতে পারলেন, তাই তিনি বললেন- "এই মায়ার সংসারে আসল প্রহেলিকা আসল মরু-মরীচিকা তোমরা - ভারতের উচ্চ বর্নেরা। ... তোমরা শূন্যে বিলীন হও। আর নতুন ভারত, বেরুক। বেরুক লাঙ্গল ধরে, চাষার কুঠির ভেদ করে জেলে, মালা, মুচি, মেথরের ঝুপড়ির মধ্যে হতে। বেরুক মোদির দোকান থেকে ভোলা ও মালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে বাজার থেকে। বেরুক ঝড়, জঙ্গল, পাহাড়, পর্বত থেকে। এরা সহস্য সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েছে, নিরবে সয়েছে, তাতে পেয়েছে অটল জীবনী - শক্তি । অতীতের কঙ্কালময় এই সামনে তোমার উত্তরাধিকারী ভবিষ্যৎ ভারত।... তুমি যাও হাওয়ায় বিলীন হয়ে, অদৃশ্য হয়ে যাও, কেবল কান খাড়া রেখো; তোমার চাই বিলীন হওয়া, অমনি শুনবে কোটি মৌ সন্ধি তৈলক্য কামনাকারি ভবিষ্যৎ ভারতে উদ্বোধন ধ্বানি -

"ওয়াহ গুরু কি ফতে"

(পরিব্রাজক , পৃষ্ঠা ৪২-৪৪)

বিবেকানন্দ শ্রমিক - চাষী - নিপীড়িত মানুষের জাগরণের কথা বলেছেন। তিনি মনে জাগরণের ফলে সমাজের পূর্ণতা আসবে। ফলে সমাজের রথ আর থেমে থাকবে না । কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তা মনে করে না। কারণ তিনি ভাবেন সমাজে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য - এরা আছে, তাই এদের অধিকার কেউ বঞ্চিত করা যায় না। তবে সমাজের অত্যাচারিত নিপীড়িত, দমিত মানুষদের রবীন্দ্রনাথ স্বাগত জানিয়েছেন। তাই তো শোনা যায়-

"আজকের মত বলো সবাই মিলে -
যারা এতদিন মরে ছিল তারা উঠুক বেচে,
যারা যুগে যুগে ছিল খাটো হয়ে

তারা দাঁড়ায় একবার মাথা তুলে।"

কিন্তু কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মনে ভয় যে, একদিন শূদ্রদের মনে ও যদি অহমবোধ সৃষ্টি হয়, তবে তারাও অন্য তিন শ্রেণীর মত হবে, ফলে সমাজের রথ আবারো চলবে না। তাই সমাজের সকল শ্রেণীর মধ্যে শুভ বোধ জাগ্রত হলে তবেই সমাজ এ সকল দ্বন্দ্বের বিলোপ ঘটবে। তাই রবীন্দ্রনাথ রথের রশিটি বুকে তুলে নিতে বলেছেন, অর্থাৎ সমস্ত মানুষের হৃদয় ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ করে যেন অসীমের প্রতীক হয়ে উঠতে পারে। মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ দূর করতে হবে। এই প্রসঙ্গে দার্শনিক ট্রাইল -এর কথা মনে পড়ে-

> There is a golden thread that runs through every religion in the world. There is a golden thread that runs through the lives and the teachings of all the prophets, seers, sages and saviours in this world's history through the lives of all men and women of truly great and lasting power. All that they have if a done or attained to has been done in all full ordinance with law. What one has done, all my do. The same golden thread must enter into the lives of all...".

[Ralph Waldo Trine: In tune with the Infinite: preference to edition]

পরিশেষে এ কথা বলা যায় রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করেন, সমস্ত স্তরের মানুষের মধ্যে প্রেম ও ভালবাসা পুনরায় জন্ম নেবে। অর্থাৎ, এক ঐক্যের মেলবন্ধন সৃষ্টি হবে। সমাজের মধ্যে বৈচিত্র্য থাকবে, কিন্তু বিভেদ সৃষ্টি হবে না, এ প্রসঙ্গে কবিগুরুর গীতাঞ্জলির কথা মনে পড়ে -

"বাতাস জল আকাশ আলো
সবার করে বাসবো ভালো,
হৃদয় সভা জুড়িয়ে তারা
বসিবে নানা সাজে ।"

অর্থাৎ সমাজের রথের রশির টানে সেদিন অহংকার লালসা, স্বার্থ থাকবে না, সেদিন কেবল মাত্র প্রেমের টানে সমাজের রথ অনন্ত কাল ধরে চলবে।

গ্রন্থ সূত্র:
ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'রথের রশি ' বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৯৩২
ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ' গীতাঞ্জলি ', বিশ্বভারতী কলকাতা,
প্রভাত, মুখোপাধ্যায়, ' রবীন্দ্র জীবনী ': তৃতীয় খন্ড: পৃষ্ঠা: ৪৪৩।

কবিতার পাতা

বিষণ্ণতা

শুভ্রা রায়

মেয়েটি অন্ধকারে একা বসেছিল। কারো জন্য অপেক্ষা করছিল কি? বোধহয় না। অপেক্ষার বিফলতা তার জানা আছে ভালোই। হয়তো কোনো সময়ে অপেক্ষা করেছিল সে, কারো জন্য – সে হয়তো জানতেও পারেনি। আলো-আঁধারি এক দোলাচলে, কোনো নাম না জানা প্রদেশে, সে অপেক্ষা হয়তো এখনও আছে – নিষ্ফল চেষ্টা করে চলেছে কাঙ্ক্ষিতকে পাবার।

এখন, এই মুহূর্তে মেয়েটি একা। নাই বা জানলাম আমরা তার প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির তালিকা। যে অন্ধকারে মেয়েটি আছে, সেটি তার একান্ত ভাবে নিজস্ব – কারো সঙ্গে ভাগ করে নেবার দায় নেই। কিন্তু এই অন্ধকার ঠিক কেমন? যখন সে কাজে যায় – পড়াতে – লোকজনের সঙ্গে কথা বলে, হাসে – যারা নাকি তাঁর বন্ধু – তখনও সে অন্ধকারে ডুবে থাকে। ক্রমশঃ অচেনা হয়ে যাওয়া শব্দদের ধরে এনে – যারা রীতিমত লড়াই করে তাঁর হাত থেকে পালিয়ে আবার সেই অন্ধকারে ডুব দেবার – সে যখন বাক্য রচনা করে এবং প্রায়ই ভুল করে – বুঝতে পারে সেটা কিন্তু শুধরোতে পারে না – তখন তাঁর মূক হওয়ায় শ্রেয় মনে হয়। উপেক্ষিত হয়, নিন্দিত হয় – আঘাত পায় কিন্তু ভেঙে পড়ে না। তখন সেই অন্ধকারই যেন দুহাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরে, আগলে রাখে, আদর করে – আঘাতকে মর্মে বিদ্ধ হতে দেয় না। বলে, “থাক না লুকিয়ে আমার কাছে, কেউ জানতেও পারবে না”। এত কিছু যখন ঘটে যায়, মেয়েটির আশে পাশের লোকজন কিন্তু কিছুই জানতে পারে না।

অন্ধকার চিরে মাঝে-মাঝে আলোর ঝলকানি হয়, বিদ্যুৎ চমকায়, বৃষ্টিও পড়ে। হটাৎ এক অদ্ভুত আশ্চর্য সূর্যাস্ত দেখে ফেলে, কিংবা পড়াতে-পড়াতে, নতুন প্রেমে-পড়া ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্র-ছাত্রীর, তাঁর চোখ এড়িয়ে চেয়ারের তলায় হাত ধরার ব্যর্থ প্রচেষ্টা দেখে, কোনো অচেনা মানুষের এক চিলতে হাসির ছোঁয়ায়, কিংবা প্রথম-রক্তের-আস্বাদ-পাওয়া-কবিতা-মুগ্ধ কোনো ছাত্রকে সহযাত্রী করে “প্রুফ্রক” বা “কেউ কথা রাখেনি”-র অলি-গলি দিয়ে হাঁটতে পারায়, বা হয়তো একটি নিশ্চিত মৃত গাছে, হটাৎ নূতন পাতা আসার আনন্দে – এরকম খাপছাড়া কিছু ঘটনায় – মাঝে মাঝে অন্ধকার গলে জল হয়ে যায় – জমাট বরফ যেন।

কিন্তু যার ধর্ম জমে থাকা, তাকে বেশিক্ষণ আটকায় কে? মেয়েটির ঠাণ্ডা অন্ধকারে ফিরে যেতে বেশী সময় লাগে না। তাঁকে মাংসের-তালে-পরিণত-করা-কোনো-লোলুপ-দৃষ্টি, না ভেবে বলা কিছু কঠিন শব্দের গোষ্ঠী, দম

বন্ধ করা মলিনতা – সেই বিদ্যুৎ চমকগুলিকে স্থায়ী হতে দেয় না, তাঁদের অজ্ঞাতবাসে পাঠিয়ে দেয়, চির নির্বাসনে।

আর, আপাতদৃষ্টিতে সাধারণ জীবন যাপন করা মেয়েটি -ডুবতে থাকে এক অদ্ভুত, অতল, আঁধারে – ফেরার ঠিকানা না নিয়েই।

বিকশিত ভারত@২০৪৭ সম্পর্কিত বিশেষ লেখা

বিকশিত ভারত – একটি প্রস্তাবনা

ডঃ শ্রীতা মুখার্জী

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

জাকির হুসেন দিল্লি কলেজ (সান্ধ্য)

‘পৃথিবীটা কেমন?’ মাস্টারের এই প্রশ্নের উত্তরে পাঠশালার কোনো এক দুষ্টু পোড়ো নাকি একবার বলেছিল যে পৃথিবীটা গোল লুচির মতো। আমরা সত্যিই জানি না পৃথিবীর আকার লুচির মতো, নাকি কমলালেবুর মতো, তবে ভারতের যে বিকশিত হতে আর বেশি দেরি নেই একথা বোধহয় এতদিনে সবাই আজ জেনে গেছেন।

বিকশিত হওয়ার লক্ষে সামিল হয়ে ভারত এগিয়ে চলছে। চলছে, নাকি ছুটছে! আমরা সবাই তাকে ছুঁতে চেয়ে নাকাল হচ্ছি নাকি! হয়তো হচ্ছি। কিন্তু তার নাগাল পাওয়ার চেষ্টাটুকু তো থাকতে হবে। দিন প্রতিদিন কত যে নতুন প্রকল্প আসছে, চোখের সামনে দিয়ে রদবদল ঘটে যাচ্ছে শহরের। শহরবাসীরও। বদল ঘটছে রাজনীতি-সংস্কৃতিতে। বদল ঘটছে দেশেরও। কিন্তু ‘দশ’ -এর বদল ঘটছে অথবা ঘটবে কি? এইতো সেদিন ২রা অক্টোবর ২০১৪তে গান্ধীজীর জন্মদিনের দিন ‘স্বচ্ছ ভারত’ প্রকল্প এলো। ঠিক তার ৯ বছরের মধ্যে এলো ‘জি-২০’ সামিট। এর মাঝখানে ডিমনিটাইজেশান আর করোনার আকস্মিক আবির্ভাব জনগণকে হকচকিয়ে দিয়ে, যাবতীয় উন্নয়নকে একপাশে ঠেলে দিতে চাইল। কিন্তু পারলো কোথায়! চলার বেগে পথ করে নিচ্ছে ‘ভারত’ । ভারত, নাকি ইন্ডিয়া, নামকরণ সংক্রান্ত মতভেদ, এও এক মহা বিতর্কের বিষয়। তবে আপাতত ভারতের নাগরিকরা, শান্তিকামী এই জনতারা, আমরা, যাবতীয় দ্বিধাদ্বন্দ্বের জায়গা ছেড়ে, নিজের নিজের গর্ত ছেড়ে বেড়িয়ে এসে এক আকাশের তলায় দাঁড়িয়েছি। নীল রঙের সেই আকাশে স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে একটিই কথা – ‘বিকশিত ভারত@২০৪৭’ ।

ভারতের বিকাশ মানে সর্বাত্মক অর্থে দেশ ও দেশবাসীর বিকাশের কথাই বলা হচ্ছে নিশ্চয়ই? মানে খাঁটি জল, বিশুদ্ধ বাতাস, রুটি-কাপড়-বসতবাড়ি সব। সব-ই। সমাজের সর্বস্তরের, সর্ব ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গের মানুষের সামনে এক আদর্শ দেশের উপমা প্রদানের প্রয়াস নিচ্ছেন সরকার। এ এক মহান কর্তব্য। এই কর্তব্যে দেশের ছাত্রসমাজকে উদ্বোধিত করার লক্ষ্যে দেশের জাতীয় শিক্ষানীতির এক বৃহৎ সংস্কারসাধন করা হয়েছে। এসেছে এনিপি-২০২০, ন্যাশনাল এডুকেশান পলিসি। এখানে মেজর ও মাইনত, মানে কোর পেপারের সঙ্গে এমন অনেক বিষয়

ছাত্রছাত্রীরা পড়ছে যাতে তারা নিজের দেশকে ভালো করে চিনতে-জানতে পারে। তাদের কারগরী বিদ্যায় রপ্ত করার সুযোগও যেমন নতুন এই শিক্ষাকাঠামোতে থাকছে, তেমনি ছাত্রছাত্রীর হোলিস্টিক ডেভলেপমেন্টের বিষয়টির দিকেও সরকার দৃষ্টি দিয়েছেন। এখন এন.ই.পি-র শিক্ষায় শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা নিশ্চয়ই নতুন যুগের কারিগর হয়ে উঠে খুব তাড়াতাড়ি হাতে অস্ত্রধারণ করে দেশের খলনলচেটা বদলে দিতে পারবে, এমন আশা করাটা নিশ্চয়ই অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিছুদিন পরে হয়ত দেখা যাবে ‘হয়ে উঠতে থাকা’ বিকশিত ভারতের নবীনতম সদস্য আট বছরের তমাল রোবট বানাচ্ছে বা ১০ বছরের স্নেহা যুদ্ধবিমান বানিয়ে বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিচ্ছে। দেশের এই উন্নতিতে আমরা গর্বিত হব ঠিকই, কিন্তু তাহলেও একটা প্রশ্ন মনে থেকেই যায়। ভারতের বিকাশলাভের জন্য কেন আরো ২৫ বছর অপেক্ষা করে থাকতে হবে! এ কেমন কথা! ২০৩০ হলে তাও কথা ছিল, কিন্তু ২০৪৭ পর্যন্ত আমি বা আমরা থাকব কিনা, সাক্ষী থাকতে পারব কিনা ‘বিকশিত ভারত’ -কে দুই চক্ষু মেলে দেখার, সে প্রশ্ন মনের আনাচে-কানাচে এখন থেকেই উঁকি মারতে শুরু করেছে। তবে সংস্কারসাধনের এই তুমুল জোয়ারে যখন শাসক-শাসিত উভয়েই গা ভাসিয়েছেন, তখন এই কাজ নিশ্চয়ই দ্রুতগতিতে হবে বলেই আশা করা যায়। হয়ত আগামী ৫ বছরের মধ্যেই ভারতের বিকাশে সক্রিয়তম ভূমিকা নেবে এন.ই.পি-র শিক্ষায় শিক্ষিত নতুন এই প্রজন্ম। আর ভারতের সেই বিকশিত রূপ দেখে বৃদ্ধ-বৃদ্ধার দল ভাববেন এমনটা আরো ৭৫ বছর আগে হলে কী ভালোটাই না হত। অন্তত দূষণ-অনাহার, অশিক্ষা-কুশিক্ষা, রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্ত, অর্থনৈতিক মন্দার শিকার হয়ে তাদের পুড়ে ঝলসে যেতে হত না। যাই হোক, যা হচ্ছে বা ভবিষ্যতে হবে, সেই বিকাশকে ত্বরান্বিত করতে সকলের সমবেত প্রয়াস দরকার। কাউকে পিছিয়ে থাকলে চলবে না। আবার বেশি এগিয়ে গিয়ে ভিড় থেকে ছিটকে গেলেও বিপদ। ‘আয় আরও বেঁধে বেঁধে থাকি’ -র মতো পরস্পরের হাতে হাত লাগিয়ে কাজ করে যেতে পারলে বিকশিত ভারতের স্বপ্নসফল অভিযানে সবাই যুক্ত হতে পারবেন। ভারতকে তখন আর কেই ‘সোনেকি চিড়িয়া’ বলবে না। ‘চিড়িয়া’ তো তবু আকাশে উড়ত, ২০৪৭-এ পৌঁছোতে পৌঁছোতে হয়তো গোটা দেশটাই ‘রক্তকরবী’ -র যক্ষপুরীর মতো সোনার খনি হয়ে যাবে আর আমরা সেখানে জনমজুরের কাজ করব। এবং কমবেশি সব মানুষই সেদিন অধীর আগ্রহে একজন রঞ্জন আর এক নন্দিনীর আসার অপেক্ষা করে থাকবে।

গণতন্ত্র এবং ভারতবর্ষ: এক যুগ

অনিকেত ঘোরাই

ছাত্র, জাকির হুসেন দিল্লি কলেজ (সান্ধ্য)

ভারতবর্ষ এক প্রাচীন দেশ। এ দেশের ইতিহাসও তেমনি বৈচিত্রময়। আর্যদের আগমনের পূর্বে সিন্দু সভ্যতার কালে সমাজ শাসিত হতো কিছু অভিজাত সম্প্রদায় বা Aristocrat দের সম্মিলিত সিদ্ধান্তের দ্বারা । একে একপ্রকার গণতন্ত্র (অন্তত আধা গণতন্ত্র) বলা চলে। এরপর শেষ হয়, বা বলা ভালো ধংস হয় (কিভাবে সেনিয়ে অবশ্য ঐতিহসিকদের মধ্যে বিতর্কের শেষ নেই) সিন্ধু সভ্যতা। একে একে প্রতিষ্ঠা পেতে শুরু করে জনপদগুলি। যারা প্রতিনিয়ত নিজেদের মধ্যে অন্তকলহে প্রবিত্ত হয়, ফলে শেষ পর্যন্ত এদের মধ্যে টিকে থাকে মাত্র ষোলোটি, যারা ষোড়শ মহাজনপদ নামে পরিচিত হয়। এগুলির মধ্যে ব্রিজির রাজধানী বৈশালীতে গণতন্ত্রের উপস্থিতির প্রমাণ পাওয়া যায়। এরপর চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের নেতৃত্বে মৌর্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা হয়।

এরপর থেকে ভারতবর্ষে ক্রমাগত বিভিন্ন সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা পুনঃপ্রতিষ্ঠা হতে থাকে। কিন্তু কোথাওই গণতন্ত্র ছিল না। অবশেষে ভারতের বুকে প্রতিষ্ঠা হয় ইংরেজ শাসন এবং তারই সঙ্গে চলতে থাকে অকল্পনীয় শোষণ।

তবে শুধু যে শোষণ হয় তাই নয়, নবজাগরণ পরবর্তী ইউরোপে প্রচলিত মুক্ত এবং স্বাধীন উদার চিন্তা(Liberalism) এর সঙ্গে পরিচিত হয় ভারতীয়রা। ফলে হাজার হাজার বছর ধরে ভারতীয় সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন কুপ্রথার বিরুদ্ধে সরব হয় আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত একদল ভারতীয়। যার কেন্দ্রবিন্দু ছিল অবশ্যই বাংলার রাজধানী কলিকাতা নগরী।

ইংরেজরা ভারতীয়দের যে ঠুনকো আশ্বাসের জালে বেধে রেখেছিল; তা ভাঙে লর্ড লিটন কতৃক বিচার ক্ষেত্রে প্রচলিত চরম বৈষম্য মূলক নীতির জেরে। ভারতীয়রা বুঝতে পারে যে তারা যেই ইংরেজ শাসনকে ঈশ্বরের আশীর্বাদ মনে করে এসেছে, তা আসলে কোনো অভিশাপের চেয়ে কিছু মাত্র কম নয়। ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠা পায় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, যার নেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্ধোপাধ্যায় নেতৃত্বে লর্ড লিটন কতৃক প্রবর্তির ভেদভাবমূলক আইনের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন শুরু হয়। অবশেষে ইংরেজ সরকার তার এই সিদ্ধান্ত ফেরত নিতে বাধ্য হয়।

এর কিছু সময় পর লর্ড কার্জন বাংলা ভাগ করেন, প্রশাসনিক কাজকর্মের সহজতার ভিত্তিতে। কিন্তু তৎকালীন ভারতীয় সমাজ (বিশেষত বাঙালি সমাজ)এই সিদ্ধান্তকে মোটেও ভালো চোখে দেখেনি । বাংলার বাবু সমাজ মনে করে ইংরেজ সরকার ভাইকে ভাইয়ের থেকে আলাদা করতে, হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ভেদ বাড়াতে ঔপনিবেশিক সরকার এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। (তাদের রাগের আসল কারণ ছিল অবশ্য অন্য। কলকাতা শহরে বসে নায়েব-

গোমস্থা আর পাইক-লেঠেল দিলে পূর্ব বঙ্গের যে বিশাল জমিদারি তারা পরিচালনা করতেন, তা জমিদার বাবুদের হস্তবহির্ভূত হতে চলেছিল আরকি)। ফলে জাতীয়তাবাদের আরে নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য তারা আন্দোলন শুরু করে। (বলে রাখা ভালো, এই সব জমিদারেরা উগ্র ভাষণ দেবার বেশি আর কিছু পারতেন না)। আন্দোলনকে আসলে পরিচালনা করেন হাতে গোনা কিছু প্রকৃত স্বদেশ প্রেমী মানুষ এবং জমিনী ক্ষেত্রে রূপ দেয় একদল তরুণ যুবকের দল। আর স্বভাবতই ফাসি, কালাপানির মতো শাস্তিগুলো জোটে তাদেরই মাথায়। এই কারণেই এই আন্দোলন বঙ্গ ভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের পরিবর্তে যে নামে অধিক প্রচারিত হয় তা হল স্বদেশী আন্দোলন।

পাঠকদের মনে হতে পারে ‘গণতন্ত্রের’ প্রবন্ধে আন্দোলন কি করছে? কারণ প্রতিবাদ আন্দোলন, মত প্রকাশের স্বাধীনতাও তো গণতন্ত্রের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, তাই নয় কি?

এই আন্দোলনের জেরে ইংরেজ সরকার ঔপনিবেশিক ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে সরিয়ে প্রতিষ্ঠা করে দিল্লিতে। যা আবার স্বাধীন ভারতের রাজধানীও হবে ভবিষ্যতে।

এই সময়কালেই ১৯০৯খ্রিঃ ব্রিটিশ সরকার প্রবর্তন করে মলে-মিন্টো আইন। যাকে ভারতের সংবিধানিক গণতন্তের ইতিহাসে প্রথম গরুত্বপূর্ণ মাইলফলক বললে অত্তুক্তি হবে না। প্রথম বারের জন্য ভারতে একটি কেন্দ্রীয় আইন সভার প্রতিষ্ঠা হয়। আবার একথাও ভুললেও চলবে না যে, এই আইনের দ্বারাই প্রথমবারের জন্য ধর্মের ভিত্তিতে নির্বাচন শুরু হয়, যাকে বলা হতো Seperot Electorate।যার অবশ্য সম্ভাবী পরিণাম হল দেশভাগ। এখানে মজার কথা হল পাকিস্তান নির্মাণের পুরোধা মোঃ আলী জিন্নাহ্ প্রথমে এই পৃথক নির্বাচনের বিরোধিতা করেন, তিনি বলেন: ইংরেজ সরকার ভারতীয়দের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকে নষ্ট করার জন্য এই আইন প্রণয়ন করেছে।

ইতিমধ্যে মুসলিম লিগ প্রতিষ্ঠা হয়ে গেছে, এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ভারতের মুসলমানদের মধ্যে লিগ ব্যাপক প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হয়। ফলে, কতক’ টা বাধ্য হয়েই জাতীয় কংগ্রেস ১৯১৬খ্রিঃ লীগের সঙ্গে ‘লক্ষৌ চুক্তি’ সাক্ষর করে। এতে একদিকে কংগ্রেস যেমন পৃথক নির্বাচনী মেনে নেয়, তেমনই লীগও কংগ্রেসের ‘স্বরাজের’ দাবি মেনে নেই; এবং তারা সম্মিলিতভাবে ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে শামিল হয়।

এরপর 1919খ্রিঃ আবার একটি গুরুত্বপূর্ণ আইন প্রণীত হয় --- ‘মন্টেগু-চেমসফোর্ট’ সংস্কার আইন। যাকে ভারতে সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা স্থাপনের ক্ষেত্রে এক মাইলফলক বলা যেতে পারে।

উল্লেখ্য, ইতিমধ্যেই গান্ধীজি ভারতে ফিরে এসেছেন, এবং কংগ্রেসের নেতৃত্বসহ ভারতের জাতীয় আন্দোলনকে নতুন দিশা দেন। এই সময়েই পেশ হয় 'নেহরু রিপোর্ট' , যাতে প্রথমবারের জন্য ভারতের সংবিধান তৈরির কথা ঘোষিত হয়, না শুধু ঘোষিত হয় না বরং প্রথমবারের জন্য একটি Draft ও তৈরি করা হয়। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার তাতে তেমন আমল দেয় না। ফলে, ভারতীয়রা আবার ইংরেজবিরোধী আন্দোলনে ঝাপিয়ে পরে। তীব্র মিটিং-মিছিল, আন্দোলন-প্রতিবাদের পর ঔপনিবেশিক সরকার কিছুটা পেছু হটে । সাইমন কমিশন গঠিত হয়, যার উপর ভারতের সংবিধান নির্মাণের দায়িত্ব দেয়া হয় । কিন্তু এতে একজনও ভারতীয় সদস্য ছিল না, ভারতীয়রা এই কমিশনকে মানবে কেন ? তারা এই অভারতীয় কমিশনকে বর্জন করে।

এরপর উল্লেখ্য ঘটনা হল, ১৯৩০ সালের ২৬ জানুয়ারি, কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে পাস হওয়া 'পূর্ণ-স্বরাজ রেজুলিউশন' , যেই দিনটিকে পরবর্তীতে স্বাধীন ভারতে গণতন্ত্র দিবস হিসাবে গ্রহণ করা হবে। এই রেজুলিউশনের মাধ্যমে কংগ্রেস ঘোষণা করে যে তারা আর Domitile status নিয়ে সন্তুষ্ট হবে না, তারা চাই ইংরেজ সরকারের পতন এবং ভারতের পূর্ণ-স্বাধীনতা।

এরপর ১৯৩৫ সালে ঐতিহাসিক ভারত শাসন আইন, 1935 প্রণীত হয়। আধুনিক ভারতের শাসন বাবস্থায় এই আইনের গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ ১৯৫০ সালে গৃহীত স্বাধীন ভারতের সংবিধানের এক বৃহদাংশ এই আইন থেকেই সংগৃহীত হয়। এই আইনের মাধ্যমেই ঔপনিবেশিক ভারতের বিভিন্ন প্রদেশগুলোতে প্রথমবারের জন্য প্রাদেশিক সরকার এবং আইনসভা নির্বাচিত হয়, অবশ্য এই নির্বাচনে অংশ গ্রহণের অধিকার খুব অল্প সংখ্যক ভারতীয়দেরই দেওয়া হয়। এছাড়া কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের মধ্যে যে ক্ষমতার বিভাজন ও Federal সম্পর্ক আজ লক্ষ্য করা যায়, তাও এই আইনেই প্রথম উল্লিখিত হয়।

যায় হোক, এই আইনের মাধ্যমে ভারতের প্রদেশগুলিতে (দু-একটি ব্যতিক্রম বাদে) সরকার গঠন করে জাতীয় কংগ্রেস প্রথমবারের জন্য সরকার পরিচালনার অভিজ্ঞতা লাভ করে। কিন্তু এই আধা-স্বরাজ পেয়ে কংগ্রেসসহ ভারতীয়দের অধিকাংশই সন্তুষ্ট হয়না । তারা পুনরাবিত্ত করেন লোকমান্য তিলকের সেই বিখ্যাত লাইনটির: "Swaraj is my birth right and I shall have it."

এরপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে, ইংরেজ সরকার ঘোষণা করে 'মিত্র পক্ষের' পক্ষে ভারতও এই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করবে। এই সিদ্ধান্তের বিরোধীতা করে সমস্ত প্রদেশ গুলির কংগ্রেস সরকার একযোগে ইস্তফা দেয়। একইসঙ্গে সরকারের সাথে কথা-বার্তা চলতে থাকে। এই সময়ে ক্রিপস মিশন ভারত আসে, এতে মোট ১৩ টি প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, যার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখ যোগ্য হল ভারতকে 'Domitile Status' প্রদান করা হবে এবং বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলে ভারতীয় সদস্যদের নিয়ে একটি সংবিধান সভা গঠিত হবে: যারা ভারতের সংবিধান তৈরি

করবে। কিন্তু কথায় বলে, ‘ঘর পোড়া গরু শিদূরে মেঘ দেখলে দড়ায়’ । প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কালেও এরকম প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল ভারতীয়দের, কিন্তু যুদ্ধ শেষ হলে ঔপনিবেশিক সরকার তাদের সমস্ত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে বিন্দু মাত্র দ্বিধা বোধ করে না। তাই এমন পরিস্থিতিতে কংগ্রেস শুরু করে ‘ভারত ছাড়ো আন্দোলন’ । একদিকে বিশ্বযুদ্ধ, অন্যদিকে এরকম ভারতব্যাপী আন্দোলনে সন্ত্রস্থ্ হয়ে সরকার সমস্ত জাতীয় নেতাদের জেলে পোরে । ফলে আবারও একবার জাতীয় আন্দোলনের গতি স্তিমিত হয়। অবশেষে, জার্মানির আত্বসমর্পণের পর বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলে, জাতীয় নেতার মুক্তি পান।

কিন্তু ইতিমধ্যে, দ্বিজাতি তত্ব প্রচারের মাধমে যে সাম্প্রদায়িক বিষ সমাজে মিশ্রিত হয়, তার দ্বারা ভারতভাগ একপ্রকার অবশ্যসম্ভাবী হয়ে পরে। তবুও ভারতকে অখণ্ড রাখার শেষ প্রয়াস হিসাবে, ব্রিটেনের নবনির্বাচিত এটলির লেবার পার্টির সরকার ভারতীয়দের সামনে ‘আগস্ট প্রস্তাব’ পেশ করে। কিন্তু একদিকে এতে একটি অত্যন্ত দুর্বল কেন্দ্র সরকার স্থাপনের কথা বলা হলে কংগ্রেস এই প্রস্তাবকে নাকোচ করে, আবার কোনো পৃথক মুসলিম অধ্যুষিত দেশ/প্রদেশের উল্লেখ না থাকায় লীগও এই প্রস্তাবকে নকোচ করে দেয়। দেশভাগ রোধের শেষ প্রয়াস হিসাবে চক্রবর্তী রাজগোপালাচারী একটি plan কংগ্রেস ও লীগের সামনে রাখে, যাতে বলা হয় কংগ্রেস ও লীগ সম্মিলিতভাবে ইংরেজ সরকারের বিরোধিতা করবে, এবং দেশকে স্বাধীন করবে; তারপর দেশ স্বাধীন হলে তারা নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে দেশভাগের বিষয়টি আলোচনা করবে। কিন্তু স্বভাবতই লীগ এই প্রস্তাবকে নকোচ করে দেয়। ফলে দেশভাগ একপ্রকার সময়ের অপেক্ষা হয়ে রয়ে যায় মাত্র। ৩ জুন, ১৯৪৭ ব্রিটিশ পার্লামেন্ট থেকে India Independence Act, 1947 পাস হয়। যা ‘মাউন্টব্যটেন প্ল্যান’ নামেও পরিচিত, যার মাধ্যমে একদিকে যেমন ভারতের স্বাধীনতা ঘোষিত হয়, অন্যদিকে তেমনই ব্রিটিশ ভারত ভাগ করে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র যথা --- ভারত ও পাকিস্তান গঠিত হয়। যেন স্বাধীনতা লাভের ওজ্জল্লে, দেশভাগের কাল মেঘ অন্ধকার করে দেয়।

এরপর সবে মাত্র স্বাধীনতা লাভ করা দেশ ভারতের সংবিধান নির্মাণের কাজে জুটে পড়েন রাষ্ট্রীয় নেতারা। সংবিধান সভা বা Constituent Assembly এর সদস্যরা প্রাদেশিক আইনসভাগুলি থেকে নির্বাচিত হয়ে আসেন। সংবিধানসভার প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয় ১৯৪৬ সালের ৯ ডিসেম্বর। বলে রাখা ভালো, মুসলিম লীগের কোনো সদস্যই প্রথমে এই সভায় অংশগ্রহণ করেননি; পরে দেশ ভাগ হলে ভারতে থেকে যাওয়া প্রদেশগুলি থেকে নির্বাচিত হওয়া লীগের সদস্যরা সংবিধান সভায় অংশগ্রহণ করেন। সংবিধান নির্মাণকালে নির্মাতারা কয়েকটি অন্য দেশের সংবিধান এবং শাসন বাবস্থাকে ‘model’ হিসাবে গ্রহণ করেন। যেমন সংবিধান নির্মাতাদের কাছে দুই প্রকারের শাসন বাবস্থার নিদর্শন ছিল, যথা–ব্রিটেনের Parliamentary বা সংসদীয় শাসন বাবস্থা এবং আমেরিকার Presidential বা রাষ্ট্রপতি কতৃক শাসন। Presidential form of governance এ

সরকারের স্থায়িত্ব থাকলেও, ভারত সংসদীয় শাসন বাবস্থাকেই বেছে নেই। এর পেছনে দুটি প্রধান কারণ রয়েছে। ১. ইতিপূর্বে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে জাতীয় কংগ্রেস সংসদীয় প্রণালীতে শাসন করেছে, ফলে তাদের অভিজ্ঞতা রয়েছে; ২. সংসদীয় প্রণালীতে সরকার সর্বদা সংসদের কাছে জবাব দেহি থাকে, অন্যদিকে রাষ্ট্রপতি শাসন বাবস্থায় সংসদের কাছে রাষ্ট্রপতির কোনরূপ জবাবদেহি থাকে না।

এরপর মৌলিক অধিকারের উপর চর্চা হয়। ইংরেজ শাসনকালে পুলিশ ব্যাবস্থা ছিল শাসকের হাতে এক ভয়াবহ অস্ত্রের মতো, কারণে অকারণে ভারতীয়দের জেলে পোড়া, অকথ্য অত্যাচার ছিল নিত্য ঘটনা। ফলে অনেক নেতা দাবি করেন যে, পুলিশ ব্যবস্থাকেই সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করে দেওয়া হোক, এবং নাগরিকদের অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া হোক; কিন্তু সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল একে এক অলীক কল্পনা বা Utopia এর সঙ্গে তুলনা করেন। কারণ একজনকে যদি অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া হয়, তবে তা কখনো কখনো অন্য আর একজনের স্বাধীনতার পথে বাধা হতে পারে। তাই তিনি বলেন, নাগরিকদের বিভিন্ন মৌলিক অধিকার দেওয়া হবে ঠিকই; কিন্তু তা সর্বদা একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত। বলা হয় এই মৌলিক অধিকারগুলো কোনো অবস্থাতেই নাগরিকদের থেকে কেড়ে নেওয়া, বা কমানো যাবে না। কিন্তু ডাঃ আম্বেদকর বলেন, এমনটা সম্ভব নয়; যদি কখনো রাষ্ট্রের নিজের অস্তিতের উপর সংকট দেখা দেয়, তবে নাগরিক অধিকার নয় রাষ্ট্র আগে নিজেকে রক্ষা করবে।

আবার ভারতে caste বা জাতের নামে ভেদভাব এবং অনাচার অত্যাচারের এক কলুষিত ইতিহাস রয়েছে। কোনো স্বাধীন দেশে এরকম ভেদভাব অনুচিত, তাই জাতি বাবস্থাকে সমূলে নির্মূল করতে Article 14 এবং 15 কে সংবিধানে স্থান দেওয়া হয়। যার দ্বারা জন্ম, ধর্ম, জাত, লিঙ্গ, রং প্রভিত্তির ভিত্তিতে কারো সঙ্গে ভেদভাব করা যাবে না। Article 23 এবং 24 এ নাগরিকদের বঞ্চনার বিরুদ্ধে অধিকার দেওয়া হয়। article 25-28 এ ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার দেওয়া হয়। article 29 এবং 30 এ দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়দের শিক্ষা এবং নিজ ভাষা ও সংস্কৃতি সংরক্ষণের অধিকার দেওয়া হয়।

এর বাইরে এমন কিছু ধারা সংবিধানে সংযুক্ত করা হয় যেগুলি হয়তো তৎকালীন সময়ে বিভিন্ন প্রতিকূলতার জন্য নাগরিকদের দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না, কিন্তু যেগুলি একটি welfare state গড়া, এবং social এবং economic justice/ ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য অত্যন্ত আবশ্যক। যাদের নাম দেওয়া হয়, Directive Principles of State policy । এগুলি আইনের মাধ্যমে (by the court of law) প্রতিষ্ঠা যোগ্য না হলেও এগুলি মৌলিক অধিকারের চাইতে কিছুমাত্র কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। এই জন্যই এই DPSP গুলিকে বাস্তবায়িত করার জন্য Article 31 পথে এলে 1978 সালে 44 তম সাংবিধানিক সংশোধন করে 'সম্পত্তির মৌলিক অধিকার' কে বাদ দিয়ে Article 300A তে legal right হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

এছাড়া সম্পূর্ণ স্বাধীন বিচারপ্রণালী/ Judiciary তৈরী করার জন্য তাকে সরকারের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করা হয়। দেশে স্বাধীন এবং মুক্ত নির্বাচন প্রক্রিয়ার জন্য সরকারের হস্তক্ষেপ মুক্ত নির্বাচনী আয়োগ বা Election Commission গঠিত হয়।

এরপর 1951-52 সালে অনুষ্ঠিত হয় ভারতের প্রথম সাধারণ নির্বাচন। যখন পশ্চিমের দেশগুলীর কোথায় গায়ের রঙের ভিত্তিতে কেও ভোট দিতে পারতো না, কোথাও বা লিঙ্গের ভিত্তিতে ভোট দিয়ে পারতো না, আবার কোথায় প্রত্যক্ষ কর প্রদানকারী না হলে ভোট দিতে পারতো না; সেখানে ভারত নিবাধায়, নির্দিধায় তার সকল প্রাপ্ত বয়স্ক নাগরিকদের ভোটাধিকার প্রদান করে। তৎকালীন পরিস্থিতিতে তা কোনো সামাজিক বিপ্লবের চেয়ে কম ছিল না। উইনস্টন চার্চিলের মতো কিছু লোক এবিষয়ে ভারতকে নিয়ে মস্কোরা করে, কিন্তু তাদের দেশকেই আজ ভারতের মতো 'Universal adult franchise' অনুযায়ী তার নাগরিকদের ভোটাধিকার দিয়েছে। যা থেকে ভারতীয় রাষ্ট্র নেতাদের দুরদৃষ্টিতর প্রমাণ পাওয়া যায়। যাইহোক, 1952 সালের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে জাতীয় কংগ্রেস ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠটা লাভ করে। এবং তার থেকেও বড় কথা বিরোধী দলগুলি তাদের পরাজয় স্বীকার করে। যার থেকে নির্বাচনের মুক্ত এবং স্বাধীনভাব (Free & Fairness) নিয়ে অন্যান্য দেশ গুলির মনেও কোনো দ্বিধা থাকে না।

সংবিধান নির্মাণ কালে অনেকে একথাও বলেছিলেন, যে সংবিধান সভার সদস্যরা প্রাদেশিক আইনসভার দ্বারা নির্বাচিত হয়েছিলেন, তাহলে তারা সমগ্র দেশের জন্য সংবিধান নির্মাণের অধিকার পেল কোথা থেকে? কিন্তু সংবিধান সভার অধিকাংশ সদস্যই সাধারণ নির্বাচনে পুনরায় নির্বাচিত হলে তাদের এই জিজ্ঞাসা দূর হয়।

তারপর থেকে বিভিন্ন ভালো-মন্দের পরেও ভারতের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অক্ষুন্ন রয়েছে এবং তারই সাথে সংবিধানের সর্বোচ্ছতাও বজায় রয়েছে। যদিও কিছু কিছু সময় গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার উপর আক্রমণ হয়েছে, এবং হচ্ছে তবুও ভারতের গণতন্ত্র আজও অটুট রয়েছে এবং আমার ধীরো বিশ্বাস আগেও থাকবে।

২০৪৭ অব্দি কেমন ভারত দেখতে চাই

সঞ্জনা পাইক

ছাত্রী, জাকির হুসেন দিল্লি কলেজ (সান্ধ্য)

১) উন্নত অর্থনীতি ও প্রযুক্তিগত উন্নতি -

২০৪৭ সালের ভারতে একটি স্বপ্নময় ভবিষ্যত আমাদের অপেক্ষায় রয়েছে। অর্থনৈতিক উন্নতির সাথে সাথে প্রযুক্তির উন্নতি একত্রে আসবে, যা বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুবিধা ও সুস্থিরতা নিশ্চিত করবে। মোবাইল টেকনোলজি, নিউক্লিয়ার পাওয়ার, সাইবার সিকিওরিটি, রোবোটিক্স, বায়োটেকনোলজি – এই ক্ষেত্রে পরিশোধন, উদ্ভাবন, এবং উন্নতি একাধিক দিকে আরো গতিপ্রাপ্ত হবে। একটি আদর্শ অর্থনৈতিক পরিবেশে উন্নত বাঙালি সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে, যা সকলের জন্য সমৃদ্ধি ও সমতা নিশ্চিত করবে।

২) পরিবেশ সংরক্ষণ ও সামাজিক ন্যায় –

২০৪৭ সালের ভারতে পরিবেশের সংরক্ষণ ও সামাজিক ন্যায় প্রাথমিকতা পাবে। বাঙালি সমাজ পরিবেশ সংরক্ষণের প্রতি গভীর সচেতনতা অর্জন করবে এবং সামাজিক ন্যায়ের ক্ষেত্রে প্রগতিশীল ধারণা এবং কার্যকারিতা অনুসরণ করবে। সমস্ত ব্যক্তির জন্য সমান অধিকার ও সুযোগ নিশ্চিত করা হবে, যা ভারতীয় সমাজে সমানতা ও সহানুভূতির একটি সাথে মহৎ উন্নতিপন্থা নির্ধারণ করবে।

২০৪৭ সালের ভারতে আমাদের স্বপ্নময় পরিবেশের সম্ভাব্য মহান ছবি এবং পরিপূর্ণ সামাজিক উত্থানের ধারণা করা হয়েছে। এই প্রত্যাশা সাকার করার জন্য পরিশ্রম ও প্রতিশ্রুতির সাথে এগিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন। “বিকশিত ভারত” একটি অত্যন্ত উদ্দীপক উদ্দিষ্ট যেখানে ২০৪৭ সালের জন্য একটি আদর্শ ধারণা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এই ধারণার মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলি হল এরকম –

ক) উন্নত অর্থনীতি – একটি পরিবর্তিত ভারতে অর্থনীতির উন্নতি হবে যেখানে উদ্যোগ, বানিজ্য, প্রযুক্তি এবং প্রকৌশল একসাথে মিলে একটি প্রগতিশীল অর্থনীতি তৈরি করবে।

খ) বিকশিত শিক্ষাব্যবস্থা – উচ্চমানের শিক্ষা প্রবৃদ্ধি করোতে প্রয়োজন হবে, যেখানে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল এবং সামাজিক বিজ্ঞানে অগ্রগতি হবে।

গ) পরিবেশ সংরক্ষণ – বিকশিত ভারতে পরিবেশের সংরক্ষণ ও পরিস্থিতির সঙ্গে সম্পৃক্ত দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে।

ঘ) সামাজিক ন্যায় ও সমতা – সামাজিক ন্যায় এবং সাম্যের মৌলিক অধিকারগুলির মিলনে পরিচিত ভারতের নির্মাণ হবে।

উপরোক্ত বিষয়গুলির উপর আমরা কাজ করলে আগামী দিনে আমাদের ভারত একটি নিজস্ব পরিচিতি স্থাপনা করতে পারবে।

২০৪৭ অব্দি কেমন ভারত দেখতে চাই

সোহম খান

ছাত্র, জাকির হুসেন দিল্লি কলেজ (সান্ধ্য)

‘বিকশিত ভারত’ এর অর্থ -

‘বিকশিত ভারত’ শব্দের অর্থ ‘উন্নত ভারত’ । ‘বিকশিত ভারত’ ২০৪৭ সালে ১০০ তম স্বাধীনতার মাধ্যমে দেশকে একটি উন্নত সত্তায় রূপান্তরিত করার জন্য সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিনিধিত্ব করে। ‘বিকশিত ভারত’ - এর চারটি স্তম্ভ হল যুবক, গরীব, মহিলা এবং কৃষক।

বিকশিত ভারত@২০৪৭ ঃ দৃষ্টি, উদ্দেশ্য এবং তাৎপর্য

বিকশিত ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি হল আধুনিক অবকাঠামো এবং প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি সমৃদ্ধ ভারত এবং সমস্ত অঞ্চলের সমস্ত নাগরিককে তাদের সম্ভাবনায় পৌঁছোনোর সুযোগ দেওয়া।

অর্থমন্ত্রী, তার অন্তর্বর্তী বাজেট ২০২৪-এর বক্তৃতায় বলেছিলেন যে ‘বিকশিত ভারত’ -এর দৃষ্টিভঙ্গী বাস্তবায়নের জন্য রাজ্যগুলিতে অনেক উন্নয়ন এবং বৃদ্ধি-সক্ষম সংস্কার প্রয়োজন। এইভাবে, ৫০-বছরের সুদ-মুক্ত ঋণ হিসাবে ৭৫০০০ কোটি টাকার বিধান রাজ্য সরকারগুলিকে তাদের মাইলফলক সংযুক্ত সংস্কারগুলিকে সমর্থন করার জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে। MSME-এর বৃদ্ধি এবং প্রতিযোগিতার সাহায্য করাও ‘বিকশিত ভারত’ -এর রোডম্যাপের একটি অংশ হবে।

১১ই ডিসেম্বর ২০২৩-এ প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে ‘বিকশিত ভারত@২০৪৭ ঃ যুবদের ভয়েস ’ চালু করেছিলেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি একজন ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা তুলে ধরে বলেন, একটি জাতি তখনই উন্নত হয় যখন তার জনগণের উন্নয়ন হয়। তিনি বিকশিত ভারত-এর অভিন্ন লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এবং যুবকদের শক্তিকে চালিত করার প্রয়োজনীয়তার উপরও জোর দেন। দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং জনসংখ্যাগত পরিবর্তনের ফলে উদ্ভূত চ্যালেঞ্জগুলি ব্যাপকভাবে বিবেচনা করার জন্য সরকার একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠন করবে। এই কমিটি ব্যাপকভাবে বিকশিত ভারত-এর লক্ষ্য সম্পর্কিত এই চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবিলা করার জন্য সুপারিশ করবে।

২০৪৭ সালে বিকশিত ভারতকে বিভিন্ন দিক থেকে কীভাবে দেখা উচিত?

‘বিকশিত ভারত’ ২০৪৭ হল সালের মধ্যে স্বাধীনতার ১০০তম বছরে ভারতকে একটি উন্নত দেশে রূপান্তরিত করার স্বপ্ন। এই রূপকল্পটি সালের মধ্যে ভারতকে একটি উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য অর্থনৈতিক বৃদ্ধি, পরিবেশগত স্থায়িত্ব, সামাজিক অগ্রগতি এবং সুশাসনের মতো উন্নয়নের বিভিন্ন দিককে অন্তর্ভূক্ত করে।

২০৪৭ সালে ‘বিকশিত ভারত’ -এর বিভিন্ন দিক কেমন হওয়া উচিত, তা নীচে দেওয়া হল –

- অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি – বিকশিত ভারতে একটি স্থিতিস্থাপক এবং শক্তিশালী অর্থনীতি থাকা উচিত যা তার সমস্ত নাগরিকদের জন্য সুযোগ এবং উচ্চ জীবনযাত্রার মান প্রদান করোতে পারে। অর্থনীতিকে উদ্যোক্তা, উদ্ভাবন এবং প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে ২১ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে সক্ষম হওয়া উচিত।

- পরিবেশগত স্থায়িত্ব – ভারতের জীববৈচিত্র্য এবং প্রকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের জন্য বিকশিত ভারতে একটি পরিস্কার এবং সবুজ পরিবেশ থাকা উচিত। পরিবেশ পুনরুদ্ধার, সংরক্ষণ এবং স্থিতিস্থাপকতার ওপর ভিত্তি করে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবগুলি হ্রাস করোতে সক্ষম হওয়া উচিত।

- সামাজিক অগ্রগতি – একটি বিকশিত ভারতে একটি অন্তর্ভূক্তিমূলক এবং সুন্দর সমাজ থাকা উচিত যা তার সমস্ত নাগরিকের মর্যাদা এবং মঙ্গল নিশ্চিত করে। সমাজের ন্যায়বিচার, সমতা এবং বৈচিত্রের উপর ভিত্তি করে ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য উদ্‌যাপন এবং সম্মান করতে সক্ষম হওয়া উচিত।

- সুশাসন – একটি বিকশিত ভারতে সঠিক নীতি এবং জবাবদিহির সাথে একটি চটপটে প্রশাসন থাকা উচিত। একটি সুশাসন ব্যবস্থা হল যেখানে বিশ্বাসযোগ্য তথ্য সংগ্রহ, সংশোধনের জন্য ক্ষেত্রগুলি বিশ্লেষণ এবং দলগত কাজ, প্রতিফলন, সহানুভূতি এবং পরামর্শের ভিত্তিতে দেশকে উন্নত করার জন্য দ্রুত কাজ করার ব্যবস্থা রয়েছে।

সোসাইটি সংবাদ

ইংরেজি লিটারারি সোসাইটি রিপোর্ট

একাডেমিক বছর ২০২৩-২০২৪

ভূমিকা:

ইংলিশ লিটারারি সোসাইটি জাকির হোসেন দিল্লি কলেজ (সান্ধ্য) এর প্রধান সোসাইটিগুলির মধ্যে একটি। এটি দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্য সমিতিগুলির মধ্যে একটি সুপ্রতিষ্ঠিত এবং সম্মানিত খ্যাতি উপভোগ করে। সোসাইটি অসংখ্য ইভেন্টের আয়োজন করে যা শিক্ষার্থীদের তাদের সাহিত্যিক দক্ষতা এবং অন্যান্য পাঠ্য বহির্ভূত প্রতিভা প্রদর্শনের জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম হিসাবে কাজ করে। এটি বেশ কয়েকটি প্রতিযোগিতামূলক আন্ত-কলেজ ইভেন্টের আয়োজন করে, যার মধ্যে কুইজ, সৃজনশীল লেখার প্রতিযোগিতা, মনো-অভিনয় পারফরম্যান্স এবং মেম/রিল-মেকিং প্রতিযোগিতা ইত্যাদি থাকে। তদুপরি, বুদ্ধিবৃত্তিক বক্তৃতা সমৃদ্ধ করতে এবং সদস্যদের দিগন্তকে প্রসারিত করতে সমিতি নিয়মিতভাবে কর্মশালা, সেমিনার, বক্তৃতা সিরিজ এবং প্যানেল আলোচনা পরিচালনা করে।

সদস্য:

ইংলিশ লিটারারি সোসাইটির নিবেদিত দলে ফ্যাকাল্টি সদস্য শ্রী সক্ষম অরোরা (আহ্বায়ক) এবং অধ্যাপক ডঃ আনাস তাবরেজ (বিভাগীয় প্রধান) এর মত অনেক ব্যক্তিত্ব অন্তর্ভুক্ত। ছাত্র শাখায় বারোজন স্বেচ্ছাসেবক সহ সাতজন মূল সদস্য রয়েছে। সোসাইটির প্রতিনিধিত্ব করছেন মিঃ মধুসূদন ত্যাগী (সভাপতি), শ্রী আমান সিং (ভাইস-প্রেসিডেন্ট), মিসেস সন্ধ্যা কুমারী কাশ্যপ (সেক্রেটারি), মিসেস শ্রেয়া সাকলানি (যুগ্ম সেক্রেটারি), মিসেস রৌনক খারে (স্পন্সরশিপ হেড), মিসেস মনিসকা লিট (সোশ্যাল মিডিয়া প্রধান), এবং মিসেস হুদা আকরাম (কোষাধ্যক্ষ)।

ইভেন্ট সংগঠিত:

1. দ্য ইংলিশ লিটারারি সোসাইটি অফ জাকির হোসেন দিল্লি কলেজ (সান্ধ্য), IQAC-এর সহযোগিতায়, Viksit Bharat@২০৪৭-এর অধীনে, ১৯শে ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে "সাহিত্য এবং ওটিটি প্ল্যাটফর্মে মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব" শীর্ষক আলোচনার আয়োজন করে। প্রখ্যাত হিন্দি লেখক ডঃ নীলিমা চৌহান মহিলা লেখকদের মুখোমুখি হওয়া চ্যালেঞ্জগুলি নিয়ে আলোচনা করেছেন, তিনি মহিলা পরিচয় পুনরুদ্ধারের পক্ষে যুক্তি প্রদান

করেন। ডাঃ শুভ্রা পন্ত কোঠারি ওটিটি প্ল্যাটফর্মে মহিলাদের চিত্রাঙ্কন অন্বেষণ করেছেন এবং সমালোচনামূলক দেখার গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছেন। অনুষ্ঠানে অনেক অনুষদ সদস্য এবং ৪০ জনেরও বেশি শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিলেন।

2. জাকির হোসেন দিল্লি কলেজের ইংলিশ লিটারারি সোসাইটি (সান্ধ্য), IQAC-এর সহযোগিতায়, Viksit Bharat@২০৪৭-এর তত্ত্বাবধানে, ফেব্রুয়ারির ২৮ তারিখে, ২০২৪ "মহিলাদের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অবদান" শীর্ষক আলোচনার আয়োজন করে। এখানে ডঃ দেবেন্দর সিং (সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়) লিঙ্গ সমতার উপর বক্তৃতা করেছিলেন, সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছিলেন এবং বৈষম্য সত্ত্বেও মহিলাদের অর্থনৈতিক অবদানকে স্বীকার করেছিলেন। ইভেন্টে বেশ কয়েকটি অনুষদ সদস্য, পাশাপাশি ৪০ জনেরও বেশি শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিলেন।

3. দ্য ইংলিশ লিটারারি সোসাইটি অফ জাকির হোসেন দিল্লি কলেজ (সান্ধ্য), IQAC-এর সহযোগিতায়, Viksit Bharat@২০৪৭-এর তত্ত্বাবধানে, ৮ই মার্চ-এ "Decolonization & Indian Knowledge Systems"-এর উপর একটি অনলাইন আলোচনার আয়োজন করেছে। ডঃ সুশীল কুমার শর্মা (প্রধান ও অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ এবং এমইএল, এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়) ইংরেজি সাহিত্যে উন্নয়ন, ঔপনিবেশিক গবেষণা এবং পদ্ধতি সম্পর্কে কথা বলেছেন। তিনি গবেষণায় ভারতীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্তির পক্ষে সমর্থন জানিয়ে উন্নয়ন এবং ভারতীয় শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন। অনুষ্ঠানে প্রায় ২০০ জন উপস্থিত ছিলেন।

4. জাকির হোসেন দিল্লি কলেজের ইংলিশ লিটারারি সোসাইটি (সান্ধ্য), IQAC-এর সহযোগিতায়, Viksit Bharat@২০৪৭-এর অধীনে, ১৫ই মার্চ ২০২৪ তারিখে একটি অনলাইন একাডেমিক রাইটিং ওয়ার্কশপ আয়োজন করে। অতিথি বক্তারা ছিলেন অধ্যাপক (ড.) অর্জুন ঘোষ (অধ্যাপক, মানবিক ও সামাজিক বিজ্ঞান বিভাগ, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি, দিল্লি), ড. শ্বেতা অ্যান্টনি (সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়) এবং জনাব জ্যোতির্ময় তালুকদার (সিনিয়র রাইটিং ফেলো, অশোক বিশ্ববিদ্যালয়)। ড. অ্যান্টনি একাডেমিক পঠন এবং গবেষণা পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করেছেন, শ্রী তালুকদার গবেষণার নীতিশাস্ত্র এবং তার পরিধির বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন, এবং ড. ঘোষ গবেষণায় রেফারেন্স ব্যবস্থাপনার জন্য জোটেরো-র ব্যবহার প্রদর্শন করেছেন। অনুষ্ঠানে ৫০০-এরও বেশি মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

5. জাকির হোসেন দিল্লি কলেজের ইংলিশ লিটারারি সোসাইটি (সান্ধ্য), IQAC, ZHDCE-এর সহযোগিতায় এবং Viksit Bharat@২০৪৭-এর তত্ত্বাবধানে, "Writers at Work: Art, Creativity, and Construction" বিষয়ক একটি আন্তঃবিভাগীয় এবং বহুভাষিক প্যানেল আলোচনার আয়োজন করেছিল ১৯শে

মার্চ ২০২৪ এ। প্যানেলিস্টদের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপিকা শাহিনা তাবাসসুম (চেয়ার), অধ্যাপক ড. আনাস তাবরাইজ (মডারেটর), অধ্যাপক মুন্সি মোঃ ইউনুস, অধ্যাপক সঞ্জীব কুমার বৈশ্য, অধ্যাপক ড. প্রভাত রঞ্জন, অধ্যাপক ড. খুরশীদ আহমেদ, অধ্যাপক ড. সমীর কুমার মিশ্র এবং অধ্যাপক জহির আলী খান। ইভেন্টে অনেক অনুষদ সদস্য, পাশাপাশি ৪৫ জনেরও বেশি শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিলেন।

শ্রী সক্ষম অরোরা

আহ্বায়ক, ইংলিশ লিটারারি সোসাইটি

ফিল্ম অ্যান্ড ফটোগ্রাফি সোসাইটি রিপোর্ট

একাডেমিক বছর ২০২৩-২০২৪

ভূমিকা:

ফিল্ম অ্যান্ড ফটোগ্রাফি সোসাইটি ‘ছবি’ ফটোগ্রাফির ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং পরিচিত নাম। সোসাইটি প্রতি বছর BEAUXCA নামে তার বার্ষিক ফেস্টের আয়োজন করে, যা ফটোগ্রাফি প্রতিযোগিতা, চলচ্চিত্র নির্মাণ প্রতিযোগিতার মতো বিভিন্ন আন্তঃকলেজ প্রতিযোগিতামূলক ইভেন্টের আয়োজন করে যেখানে শিক্ষার্থীদের জন্য সৃজনশীল দক্ষতা বিকাশের পরিবেশ প্রদান করে। এই সোসাইটি সময়ে সময়ে ওয়ার্কশপ, ফটো ওয়াক, ডকুমেন্টারি স্ক্রিনিং এবং ফিল্ম মেকিং এর আয়োজন করে থাকে।

সদস্য:

ফিল্ম অ্যান্ড ফটোগ্রাফি সোসাইটির উৎসাহী দলে রয়েছেন অধ্যাপক ড. আনাস তাবরাইজ, ডক্টর শুভ্রা পান্ত কোঠারি,শ্রী আমির খান, এবং ড. সুশীল কুমার। ছাত্র দলে২৫ টিরও বেশি সদস্য এবং সাতজন নির্বাহী সদস্য রয়েছে। সোসাইটির ছাত্র শাখার প্রতিনিধিত্ব করছেন সভাপতি শ্রী জয়দীপ গৌতম, সহ-সভাপতি প্রশান্ত মেহতা, সেক্রেটারি ক্ষিতিস পান্ডে, যুগ্ম সম্পাদক মিসেস স্মৃতি, কোষাধ্যক্ষ শ্রী অনিকেত এবং আরও কয়েকজন কার্যনির্বাহী সদস্য।

ইভেন্ট সংগঠিত:

দ্য ফিল্ম অ্যান্ড ফটোগ্রাফি সোসাইটি অফ জাকির হোসেন দিল্লি কলেজ (সান্ধ্য), দিল্লি ইউনিভার্সিটি "Viksit Bharat@দ২০৪৭-এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর বক্তৃতা: যুবদের কণ্ঠস্বর" ভিডিও স্ক্রিনিংয়ের আয়োজন করেছে ১০ই জানুয়ারি ২০২৪, দুপুর ২টোয় কলেজ লাইব্রেরিতে। অনুষ্ঠানে কলেজের ৪০ জনেরও বেশি অনুষদ সদস্য এবং ৪৫ জনেরও বেশি শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিলেন।

২৭শে ফেব্রুয়ারী ২০২৪-এ, ফিল্ম অ্যান্ড ফটোগ্রাফি সোসাইটি আইকিউএসি, জেএইচডিসিই-এর সহযোগিতায় ViksitBharat@ ২০৪৭-এর উদ্যোগে, মিঃ বিক্রম নায়কের "স্পিকিং লাইনস: দ্য ইমপোর্টেন্স অফ এলিমেন্টস ইন আর্টের" উপর কর্মশালার আয়োজন করে যাতে ১০ জনেরও বেশি অনুষদ কর্মশালায় সদস্য ও ৬৫ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন।

কলেজ ক্যাম্পাসের চারপাশের একটি মনোরম এলাকা ঘুরে দেখার জন্য অংশগ্রহণকারীদের জন্য বিভিন্ন ফটো ওয়াকেরও আয়োজন করা হয়েছিল। এই ক্রিয়াকলাপটি ফটোগ্রাফারদের বিভিন্ন কৌশল নিয়ে পরীক্ষা করতে, আকর্ষণীয় মুহূর্তগুলি ক্যাপচার করতে এবং সহ অংশগ্রহণকারীদের সাথে তাদের কাজ সম্পর্কে অর্থপূর্ণ আলোচনায় জড়িত হতে দেয়। জামা মসজিদ, যমুনা ঘাট, হুমায়ুন সমাধি, লোধি গার্ডেন, চাঁদনি চক, মজনু কা টিলা, সুন্দর নার্সারিতে কিছু ফটো ওয়াক করা হয়েছিল।

ফিল্ম অ্যান্ড ফটোগ্রাফি সোসাইটি, তার বার্ষিক ফেস্ট BEAUXCA ২০২৪ এরও আয়োজন করেছিল যেখানে ২৭শে ফেব্রুয়ারি ২০২৪ স্টিল ফটোগ্রাফি এবং ফিল্ম মেকিং সম্পর্কিত দুটি প্রতিযোগিতামূলক ইভেন্ট নির্ধারিত ছিল। BEAUXCA ২০২৪-এর সমস্ত ইভেন্টের লক্ষ্য হল ফটোগ্রাফিতে আগ্রহী শিক্ষার্থীদের শেখার, তাদের প্রতিভা প্রদর্শন এবং সমমনস্ক ব্যক্তিদের সাথে সংযোগ স্থাপনের জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম প্রদান করা। ইভেন্টে বিভিন্ন কলেজ ও প্রতিষ্ঠানের ৪৬ টিরও বেশি অংশগ্রহণকারী অংশগ্রহণ করে। বিজয়ীদের মাঝে সনদসহ ৫০ হাজার টাকার পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

জাকির হোসেন দিল্লি কলেজ (ইভিনিং), দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিল্ম অ্যান্ড ফটোগ্রাফি সোসাইটি মার্চ মাসের ১৩ তারিখে, ২০২৪ -এ "অর্ধপরিবাহী প্রকল্পের উদ্বোধনী প্রকল্পে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদির বক্তৃতা" ভিডিও স্ক্রিনিংয়ের আয়োজন করেছে বিকাল ৩-টে তে কলেজ লাইব্রেরিতে। ফিল্ম অ্যান্ড ফটোগ্রাফি সোসাইটির আহ্বায়ক প্রফেসর রজনীকান্ত ভার্মার স্বাগত বক্তব্য ও সূচনা বক্তব্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। অনুষ্ঠানে শিক্ষক, শিক্ষার্থী

ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডাররা উপস্থিত ছিলেন।দ্যসেমিকন্ডাক্টর প্রকল্পের উদ্বোধন করেন ড সেমিকন্ডাক্টর ডিজাইন, ম্যানুফ্যাকচারিং এবং টেকনোলজি ডেভেলপমেন্ট এবং যুবকদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানোর জন্য ভারতকে একটি বৈশ্বিক হাব হিসাবে স্থান দেওয়ার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সেমিকন্ডাক্টর প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন ভিডিও কনফারেন্সিং সেশনের মাধ্যমে সমষ্টিগতভাবে প্রায় ১.২৫ ট্রিলিয়ন রুপি মূল্যের ‘ধলেরা’-তে বিশেষ বিনিয়োগ অঞ্চলে এবং গুজরাটের সানন্দে এবং আসামের মরিগাঁওয়ে।

ফটোগ্রাফি সোসাইটি ছাত্র এবং পেশাদার ফটোগ্রাফার উভয়ের কাজ প্রদর্শন করে মনোমুগ্ধকর প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে। এই প্রদর্শনী অংশগ্রহণকারীদের তাদের প্রতিভা এবং সৃজনশীলতা প্রদর্শনের জন্য একটি অনন্য প্ল্যাটফর্ম প্রদান করেছে। এটি প্রদর্শনীকৃত ফটোগ্রাফের উপর আলোচনা এবং প্রতিক্রিয়াকে উৎসাহিত করে, শৈল্পিক বৃদ্ধি এবং উন্নতিকে উৎসাহিত করে।

অধ্যাপক ড. রজনীকান্ত ভার্মা

আহ্বায়ক, ফিল্ম অ্যান্ড ফটোগ্রাফি সোসাইটি

আর্টস অ্যান্ড কালচার সোসাইটি রিপোর্ট

আর্টস অ্যান্ড কালচার সোসাইটি: সৃজনশীলতা এবং বৃদ্ধির জন্য একটি প্রাণবন্ত হাব হল একটি গতিশীল সম্প্রদায় যা শৈল্পিক অভিব্যক্তি এবং সাংস্কৃতিক অন্বেষণকে উৎসাহিত করার জন্য নিবেদিত। এটি বিভিন্ন ব্যাকগ্রাউন্ড এবং আগ্রহের শিক্ষার্থীদের স্বাগত জানায়, তাদের প্রতিভা বিকাশ এবং নতুন আবেগ আবিষ্কার করার জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম প্রদান করে। সমাজ শিক্ষার্থীদের দক্ষতা বিকাশ, আত্ম-প্রকাশ এবং আত্মবিশ্বাস, সহযোগিতা এবং দলগত কাজ, সাংস্কৃতিক উপলব্ধি এবং সম্প্রদায়ের অনুভূতিতে সহায়তা করে তাদের বৃদ্ধি এবং শেখার ক্ষেত্রে অবদান রাখে। জাকির হোসেন দিল্লি কলেজের আর্টস অ্যান্ড কালচার সোসাইটি (সান্ধ্যকালীন) পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কার্যকলাপের জন্য একটি সমিতির চেয়েও বেশি কিছু; এটি একটি রূপান্তরকারী স্থান যেখানে শিক্ষার্থীরা তাদের সৃজনশীল সম্ভাবনা আনলক করতে পারে, দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতি তৈরি করতে পারে এবং কলেজের প্রাণবন্ত সাংস্কৃতিক জীবনে অবদান রাখতে পারে। এই অধিবেশনে সমিতি সফলভাবে নিম্নলিখিত কর্মসূচির আয়োজন করেছে-

ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা এবং G20 - কনভারজেন্স এবং কনসার্নস (14-15 সেপ্টেম্বর, 2023)

দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতি পরিষদের সহযোগিতায়, জাকির হোসেন দিল্লি কলেজ (ইভেনিং) জি-২০-তে সিম্পোজিয়ামে বিভিন্ন থিমকে অন্তর্ভুক্ত করে একাডেমিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। একক অভিনয়, ডুয়েট, একটি ইন্সট্রুমেন্টাল পিস এবং একটি ব্যান্ড পারফরম্যান্স সমন্বিত একটি সংগীত উদযাপনের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। প্রাণবন্ত পরিবেশের সাথে যোগ করে, বিহার, আসাম, রাজস্থান, জম্মু ও কাশ্মীর, গুজরাট এবং মহারাষ্ট্রের মতো আটটি ভিন্ন ভারতীয় রাজ্যের বৈচিত্র্যময় লোক ঐতিহ্য প্রদর্শন করে নয়টি মনোমুগ্ধকর নৃত্য পরিবেশন ছিল। একটি বিশেষ হরিয়ানভি লোকনৃত্য উপস্থাপনা সাংস্কৃতিক টেপেস্ট্রিকে আরও সমৃদ্ধ করেছে। আর্টস অ্যান্ড কালচার সোসাইটির আহ্বায়ক, ড. নাহিদ সানা খান আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন, এরপর ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকার জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

দ্বিতীয় দিনের সূচনা হয় একটি চিত্তাকর্ষক কথক নৃত্য পরিবেশনের মাধ্যমে, তারপরে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং এর নেতাদের চিত্রিত একটি শক্তিশালী মঞ্চ নাটক, এরপর নেলসন ম্যান্ডেলার বক্তৃতার একটি প্রভাবশালী উদ্ধৃতি দেওয়া হয়। একটি প্রাণবন্ত একক রাজস্থানী লোকনৃত্য সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধির আরেকটি স্তর যোগ করেছে। গ্র্যান্ড ফিনালে ছিল একটি চিত্তাকর্ষক ফ্যাশন শো যা ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের বৈচিত্র্যময় পোশাক এবং টেক্সটাইল প্রদর্শন করে। আর্টস অ্যান্ড কালচার সোসাইটির সদস্য ড. সিমি রিজভী কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে, এরপর ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকার জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়।

জশন-ই-আগজ (২৩ নভেম্বর, ২০২৩)

থিয়েটার সোসাইটি, আগাজ, জশন-ই-আগাজ, মেন কি বাত শিরোনামের একটি চিন্তা-উদ্দীপক পথনাটকের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের উদযাপন শুরু করে, যা তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা ও বানোয়াট মামলায় পুরুষদের অধিকার রক্ষার জন্য আইনের অনুপস্থিতির বিষয়টি তুলে ধরে। উদ্বোধনী বক্তৃতা দেন ড. নাহিদ সানা খান, আহ্বায়ক, এরপর দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের কুলগীত পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানটি তখন সম্মানিত অতিথিদের সংবর্ধনা ও বক্তৃতা প্রত্যক্ষ করেন - অটল বিহারী বাজপেয়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর অধ্যাপক অরুণ দিবাকর নাথ বাজপেয়ী এবং কলেজের সম্মানিত অধ্যক্ষ, প্রফেসর (ড.) মাসরুর আহমেদ বেগ। ভারতের বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক টেপেস্ট্রি প্রদর্শনকারী চিত্তাকর্ষক পারফরম্যান্সের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের কেন্দ্রবিন্দু উন্মোচিত হয়। বিলিভ ইন ড্যান্স ক্রু এবং ক্রোম্যাটিক্স, কলেজের নৃত্য ও সঙ্গীত সমিতি যথাক্রমে সেমি-ক্ল্যাসিক্যাল, ক্লাসিক্যাল, গ্রুপ, ওয়েস্টার্ন এবং বলিউড সহ বিভিন্ন ধরনের নৃত্যশৈলী দিয়ে দর্শকদের মুগ্ধ করেছে। মিস্টিক, ফ্যাশন সোসাইটি, হিন্দি ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি এবং হলিউডের আইকনিক ভিলেনদের ঘিরে একটি মনোমুগ্ধকর রানওয়ে শো উপস্থাপন করেছে। আগাজ, থিয়েটার

সোসাইটি আবারও তাদের মঞ্চ নাটক মিথ্যা দিয়ে মঞ্চে নিয়েছিল, সোশ্যাল মিডিয়া আসক্তি এবং মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ায়।

ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন আর্টস এন্ড কালচার সোসাইটির সদস্য ড. আব্দুল হাফিজ। প্রশংসার চিহ্ন হিসাবে, অংশগ্রহণকারীরা স্বীকৃতির শংসাপত্র পেয়েছে এবং একটি ছাত্র সমীক্ষার মাধ্যমে মূল্যবান প্রতিক্রিয়া সংগ্রহ করা হয়েছিল। জশন-ই-আঘাজ একটি সফল, চিন্তা-প্ররোচনামূলক, এবং বৈচিত্র্যময় প্রতিভা এবং সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তির ইন্টারেক্টিভ উদযাপন হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে।

নাভারং (১২-১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪)

নাভারং হল সঙ্গীত, নৃত্য এবং ফ্যাশনের একটি প্রাণবন্ত উদযাপন, আর্টস অ্যান্ড কালচার সোসাইটি দ্বারা আয়োজিত একটি বার্ষিক অনুষ্ঠান। এই বছর এটি Viksit Bharat@2047 উদ্যোগের অধীনে পালিত হয়েছিল। এটি উত্তেজনাপূর্ণ আন্ত-কলেজ প্রতিযোগিতা এবং সঙ্গীত, নৃত্য এবং ফ্যাশনে মনোমুগ্ধকর পারফরম্যান্সের জন্য বিভিন্ন কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের একত্রিত করেছিল। আর্টস অ্যান্ড কালচার সোসাইটির আহ্বায়ক ড. নাহিদ সানা খানের উষ্ণ স্বাগত বক্তব্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়, যার পরে জাতীয় সঙ্গীত এবং দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের কুলগীত পরিবেশিত হয়। আমাদের মাননীয় অধ্যক্ষ, প্রফেসর (ড.) মাসরুর আহমদ বেগ এবং অনুষদের সদস্যরা প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত হিন্দুস্তানি শাস্ত্রীয় সেতার বিশেষজ্ঞ ডক্টর গোপাল কৃষ্ণ দাস, সঙ্গীত প্রতিযোগিতার বিচারক হিসেবে সম্মানিত হয়েছেন। প্রথম দিনটি বন্দিশ (ক্লাসিক্যাল একক), স্বর (সেমি-ক্লাসিক্যাল সোলো), বিভাগ (ক্লাসিক্যাল গায়ক), পেয়ার অন স্টেজ (ডুয়েট ভোকাল), আরপেজিও (ওয়েস্টার্ন ইন্সট্রুমেন্টাল সোলো) সহ বিভিন্ন মিউজিক্যাল ক্যাটাগরি নিয়ে উন্মোচিত হয়েছে।

দিন 2 নৃত্য প্রতিযোগিতার বিচারক, ডঃ স্মিতা সুন্দরম এবং মিসেস মীনাক্ষী শর্মার সংবর্ধনার মাধ্যমে শুরু হয়। বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মিউজিক অ্যান্ড ডান্স সোসাইটির মনোমুগ্ধকর পরিবেশনা প্রতিযোগিতার মঞ্চ তৈরি করে। শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন নৃত্য বিভাগে তাদের প্রতিভা প্রদর্শন করেছে: ক্লাসিক্যাল সোলো, সেমি-ক্লাসিক্যাল গ্রুপ, ফোক গ্রুপ, ইন্দো-ওয়েস্টার্ন গ্রুপ। নৃত্য প্রতিযোগিতার পর ফ্যাশন প্রতিযোগিতার বিচারক ড. চন্দন কুমার এবং ড. রেনু কুমারীকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। ফ্যাশন সেগমেন্টে অংশগ্রহণকারীদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে দেখা গেছে: ফ্যাশন ফিয়েস্তা (রানওয়ে শো), লে ম্যাকিলেজ ফেটে (মেকআপ প্রতিযোগিতা), মিস্টার আইকনিক এবং

মিস আইকনিক। সকল অংশগ্রহণকারীরা সার্টিফিকেট গ্রহণ করেন এবং বিজয়ীদের আমাদের সম্মানিত অধ্যক্ষ প্রফেসর (ড.) মাসরুর আহমদ বেগ স্মারক পত্র প্রদান করেন। জাকির হোসেন দিল্লি কলেজ (ইভিনিং) ফ্যাশন সোসাইটির একটি বিশেষ পারফরম্যান্সের মাধ্যমে দিনটি শেষ হয়, এরপর অধ্যক্ষের সমাপনী বক্তব্য এবং আর্টস অ্যান্ড কালচার সোসাইটির সদস্য ডঃ রাজকুমারীর ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে। নাভারং শুধুমাত্র ছাত্রদের তাদের প্রতিভা প্রদর্শনের জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম প্রদান করেনি বরং সম্প্রদায় এবং সাংস্কৃতিক বিনিময়ের বোধও গড়ে তুলেছে। অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে, সমস্ত অংশগ্রহণকারী এবং উপস্থিতদের মধ্যে একটি স্থায়ী ছাপ রেখে যায়। আর্টস অ্যান্ড কালচার সোসাইটির সদস্যরাও তাদের নিবেদিতপ্রাণ প্রচেষ্টার স্বীকৃতিস্বরূপ প্রশংসা পেয়েছেন।

জাক-ড্রাম (22-23 ফেব্রুয়ারি, 2024)

জাক-ড্রাম, আর্টস অ্যান্ড কালচার সোসাইটি দ্বারা এই বছর একটি প্রাণবন্ত বার্ষিক অনুষ্ঠান Viksit Bharat@2047-এর অধীনে আয়োজিত হয়েছিল। এটি আন্তঃকলেজ থিয়েটার প্রতিযোগিতার (মঞ্চ ও রাস্তা) জন্য বিভিন্ন কলেজের ছাত্রদের একত্রিত করেছিল। ইভেন্টটি একটি বৈদ্যুতিক ফ্ল্যাশ মবের সাথে শুরু হয়, একটি দিনের মনোমুগ্ধকর পারফরম্যান্সের জন্য মঞ্চ তৈরি করে। জাতীয় সঙ্গীত এবং দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের কুলগীতের পরে, আর্টস অ্যান্ড কালচার সোসাইটির আহ্বায়ক ড. নাহিদ সানা খান, আমাদের মাননীয় অধ্যক্ষ প্রফেসর (ড.) মাসরুর আহমেদ বেগ এবং ভিক্সিত ভারত@2047, নোডাল অফিসার ডঃ বাবলিকে স্বাগত ও অভিনন্দন জানিয়েছেন পারভীন। বিখ্যাত থিয়েটার পেশাদার, মিঃ ওম শ্রীবাস্তব এবং মিঃ সিদ্ধার্থ প্যাটেল, স্ট্রিট প্লে প্রতিযোগিতার (নুক্কাদ নাটক) বিচারক হিসাবে সম্মানিত হয়েছেন। শ্রীবাস্তব, বিভিন্ন নাট্যক্ষেত্র জুড়ে তার চার বছরের অভিজ্ঞতার সাথে, দিল্লি সরকারের কাছ থেকে শ্রেষ্ঠত্বের শংসাপত্র সহ অসংখ্য প্রশংসা পেয়েছেন। মিস্টার প্যাটেল, তিন বছরের অভিজ্ঞতার সাথে একজন পাকা অভিনেতা, নামীদামী ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামা-তে বিভিন্ন নাটকে অভিনয় করেছেন এবং বর্তমানে থিয়েটারেলা অ্যাক্টিং স্টুডিওতে একজন পরিচালক এবং অভিনেতা হিসাবে কাজ করছেন।

দ্বিতীয় দিনটি ছিল মঞ্চ নাটক প্রতিযোগিতার জন্য। আমাদের মাননীয় অধ্যক্ষ প্রফেসর (ড.) মাসরুর আহমদ বেগ, শ্রোতাদের উদ্দেশে ভাষণ দেওয়ার আগে সংবর্ধিত হন। বিজয়ীদের কৃতিত্বের সার্টিফিকেট এবং স্মারক গ্রহণের মাধ্যমে দিনটি শেষ হয়, এবং অংশগ্রহণকারী সমস্ত দলকে কৃতিত্বের শংসাপত্র প্রদান করা হয়।

জাক-ড্রাম ছাত্রদের তাদের নাট্য প্রতিভা প্রদর্শনের জন্য, সুস্থ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে এবং বিখ্যাত বিচারকদের দক্ষতার সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম প্রদান করেছে। ইভেন্টটি থিয়েটার উৎসাহীদের একটি সমৃদ্ধ সম্প্রদায়কে উৎসাহিত করেছিল, সমস্ত অংশগ্রহণকারী এবং উপস্থিতদের উপর একটি স্থায়ী ছাপ রেখেছিল।

বসন্ত (৫ মার্চ, ২০২৪)

আর্টস অ্যান্ড কালচার সোসাইটির প্রাণবন্ত ব্যানারে এবং Viksit Bharat@2047 উদ্যোগের অধীনে আরেকটি বছরের সমাপ্তি চিহ্নিত করে, বসন্ত ছাত্র অফিস-আধিকারিকদের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং অনুষদ সদস্যদের অটল সমর্থনের প্রমাণ হিসাবে দাঁড়িয়েছে। এটি ছিল প্রশংসার এক অনন্য অভিসার, শৈল্পিক অভিব্যক্তি এবং সংস্কৃতির বৈচিত্র্যময় ট্যাপেস্ট্রির জন্য একটি ভাগ করা ভালবাসা। সন্ধ্যার সূচনা হয় উষ্ণ অভ্যর্থনা দিয়ে, আন্তরিক স্বীকৃতির মঞ্চ তৈরি করে। সোসাইটির নেতৃত্ব, সকল পদাধিকারী, আহ্বায়ক এবং শিক্ষক সদস্য, যারা সৃজনশীলতা বৃদ্ধি এবং কলেজের অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করার জন্য বছর অতিবাহিত করেছেন, তাদের সংবর্ধিত করা হয়। তাদের উৎসর্গীকরণ অনুপ্রেরণামূলক বক্তৃতা এবং প্রশংসার টোকেনের মাধ্যমে স্বীকৃত হয়েছিল, সমাজের সাথে তাদের যাত্রায় একটি স্থায়ী চিহ্ন রেখে গেছে।

এই হৃদয়গ্রাহী অঙ্গভঙ্গি অনুসরণ করে, সন্ধ্যাটি শৈল্পিক প্রতিভার মনোমুগ্ধকর প্রদর্শনীতে রূপান্তরিত হয়েছিল। নৃত্যশিল্পীরা তাদের মনোমুগ্ধকর চালচলন এবং ছন্দময় পদক্ষেপের মাধ্যমে মঞ্চের ক্যানভাসে গল্প এঁকেছেন। সঙ্গীতশিল্পীরা কেন্দ্রের মঞ্চে নেওয়ার সাথে সাথে বাতাস সুরের সাথে জীবন্ত হয়ে ওঠে। একক কণ্ঠশিল্পীরা তাদের হৃদয়গ্রাহী পরিবেশনা দিয়ে শ্রোতাদের বিমোহিত করেছিল, যখন যন্ত্রশিল্পীরা শব্দের ট্যাপেস্ট্রি বুনেছিলেন। ফ্যাশন বিভাগটি রঙ এবং ডিজাইনের ক্যালিডোস্কোপ দিয়ে সন্ধ্যাকে আরও আলোকিত করেছিল। অবশেষে, একটি নাট্য পরিবেশনা সন্ধ্যায় অন্য মাত্রা যোগ করে।

বসন্ত শুধু একটি অনুষ্ঠান ছিল না; এটি ছিল কঠোর পরিশ্রম, আবেগ এবং শিল্পকলার জন্য একটি ভাগ করা ভালবাসার চূড়ান্ত পরিণতি। এটি একটি প্ল্যাটফর্ম ছিল শিক্ষার্থীদের জন্য তাদের প্রতিভা প্রদর্শন করার, স্বীকৃতি অর্জন করার এবং তাদের সহকর্মীদের সাথে সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তির বৈচিত্র্যময় টেপেস্ট্রির মাধ্যমে সংযোগ করার।

বজম ই আদাব সোসাইটির রিপোর্ট

31 জানুয়ারী এবং 1 ফেব্রুয়ারী, 2024 তারিখে অনুষ্ঠিত প্রোগ্রামের প্রতিবেদন -

বাজমে আদব সোসাইটি, উর্দু বিভাগ, জাকির হোসেন দিল্লি কলেজ (ইভিনিং), দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়, 31 জানুয়ারী, 2024-এ Viksit Bharat@2047-এর অধীনে একটি বিভাগীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। প্রফেসর মাজহার আহমেদ অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন এবং বাজমে-ই আদব সোসাইটির সভাপতি ড. আলিয়া Viksit Bharat@2047 সম্পর্কিত সূচনা বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠান চলাকালীন, প্রফেসর শাহিনা তাবাসসুম ভিক্সিত ভারত সম্পর্কে তার চিন্তাভাবনা এবং ধারণাগুলি ভাগ করে নিয়েছিলেন, একটি আখ্যানে বুনন যা বিকশিত ভারত সম্পর্কিত আফ্রিকার একটি গল্প অন্তর্ভুক্ত করে। প্রফেসর জহির আলি খান ভারতীয় জিডিপি নিয়ে আলোচনা করেন এবং ভিক্সিত ভারত ধারণার উপর আলোকপাত করেন। ডাঃ মো. ইউসুফ বিকশিত ভারত সম্পর্কিত একটি গবেষণাপত্র উপস্থাপন করেন, 30-35 জন শিক্ষার্থী এবং উপস্থিত সমস্ত অনুষদের সদস্যদের মধ্যে ফলপ্রসূ আলোচনার উৎসাহ দেয়।

আলাপচারিতা ডঃ আলিয়ার ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে সমাপ্ত হয়, যা একাডেমিক সেটিং এর মধ্যে Viksit Bharat এর অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ অনুসন্ধান নিশ্চিত করে।

1 ফেব্রুয়ারী, 2024, বিকাল 5:00 টায় A.V. রুম, সায়েন্স ব্লক, বাজম ই আদব সোসাইটি, আইকিউএসি-র সহযোগিতায়, " বিকশিত ভারত: বৈশ্বিক রাজনীতির আলোতে" থিমের উপর একটি বক্তৃতা আয়োজন করেছে। আমন্ত্রিত বক্তারা হলেন অশোকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের ডঃ অমিত জুলকা এবং দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের জাকির হোসেন দিল্লি কলেজ (ইভিনিং) এর অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক জয় কিষাণ। অধ্যাপক মাজহার আহমেদ মঞ্চে উঠার আগে বজম ই আদবের সভাপতি ড. আলিয়া স্বাগত জানান।

বক্তৃতার সময়, ডঃ অমিত জুলকা বিশ্ব রাজনীতির প্রেক্ষাপটে বিকশিত ভারত অন্বেষণ করেন এবং আজকের বিশ্বে এর প্রাসঙ্গিকতার উপর জোর দেন। প্রফেসর জয় কিষাণ বিকশিত ভারত-এর অর্থনৈতিক দিকগুলি নিয়ে আলোচনা করেছেন। উভয় বক্তৃতা শেষে, শিক্ষার্থীরা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে এবং প্রোগ্রামটিকে লাইভ এবং ইন্টারেক্টিভ করে তোলে। IQAC-এর সমন্বয়কারী অধ্যাপক পাকিজা সামাদ, Viksit Bharat-এর সামাজিক গুরুত্ব তুলে ধরেন, যখন নোডাল অফিসার ড. বাবলি পারভীন Viksit Bharat@2047-এর বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানটিতে বিভিন্ন বিভাগের অনুষদ সদস্যসহ ৪৫ জন শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ প্রত্যক্ষ করা হয়। এবং অধ্যাপক শাহিনা তাবাসসুমের ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে আলোচনা সমাপ্ত হয়।

আন্তঃকলেজ/বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে আমীর খসরো গজল সরাইয়ের রানিং ট্রফি এবং বাইত বাজি প্রতিযোগিতা - ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪

29শে ফেব্রুয়ারী 2024-এ, বাজমে-ই-আদব সোসাইটি IQAC-এর সাথে সহযোগিতায় Vikshit Bharat@2047-এর অধীনে একটি স্মরণীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করে, যেখানে AV-তে একটি আন্ত-কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে আমীর খুসরো গজল সরাই রানিং ট্রফি এবং বাইত বাজি প্রতিযোগিতা। রুম, সায়েন্স ব্লক। ডক্টর ভীম রাও আম্বেদকর কলেজ, সেন্ট স্টিফেন কলেজ, দয়াল সিং কলেজ, মাতা সুন্দরী কলেজ এবং জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো সম্মানিত প্রতিষ্ঠানগুলি উভয় ইভেন্টে অংশগ্রহণ করেছিল। এই অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ড. আলিয়া, বাজমে আদব সোসাইটির সভাপতি, উর্দু বিভাগের, জাকির হোসেন দিল্লি কলেজ (ইভিনিং)।

বাইত বাজী প্রতিযোগিতার ফলাফল:

1. উর্দু বিভাগ, জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া: প্রথম পুরস্কার

2. শিক্ষা বিভাগ, জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া: দ্বিতীয় পুরস্কার

3. উর্দু বিভাগ, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়: তৃতীয় পুরস্কার

4. দিয়াল সিং কলেজ, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়: সান্ত্বনা পুরস্কার

আমীর খসরো গজল সরাইয়ের চলমান ট্রফি প্রতিযোগিতার পুরস্কার: 1. নাগমা আলী, মাতা সুন্দরী কলেজ: প্রথম পুরস্কার

2. গুরমেহর কৌর, মাতা সুন্দরী কলেজ: দ্বিতীয় পুরস্কার

3. আবুজার ফাতমি, জাকির হোসেন দিল্লি কলেজ (সন্ধ্যা): তৃতীয় পুরস্কার 4. মান্নান আজাদ, উর্দু বিভাগ, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়: সান্ত্বনা পুরস্কার

আমীর খসরো গজল সরাই রানিং ট্রফি প্রতিযোগিতার দলের পুরস্কার: 1. মাতা সুন্দরী কলেজ: প্রথম পুরস্কার

2. উর্দু বিভাগ, জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া: দ্বিতীয় পুরস্কার

3. শিক্ষা বিভাগ, জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া: তৃতীয় পুরস্কার

4. জাকির হোসেন দিল্লি কলেজ (সন্ধ্যা): সান্ত্বনা পুরস্কার

অনুষ্ঠানটি অংশগ্রহণকারী কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে উর্দু সাহিত্য এবং সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তির জন্য ব্যতিক্রমী প্রতিভা এবং আবেগ প্রদর্শন করে। সকল বিজয়ী এবং অংশগ্রহণকারীদের অভিনন্দন এই ইভেন্টটিকে সফল করার জন্য।

জনাব শাকিল আহমেদের মাহফিল-ই-গজল - 4 মার্চ 2024

বজম-ই-আদব সোসাইটি, ইন্টারনাল কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স সেল (IQAC) এর সহযোগিতায় এবং Viksit Bharat @2047-এর তত্ত্বাবধানে, সম্মানিত জনাব শাকিল আহমেদের একটি মুগ্ধকর মাহফিল-ই-গজলের আয়োজন করেছে। ইভেন্টটি 4 ঠা মার্চ 2024 তারিখে, কলেজ অডিটোরিয়ামের বর্ণাঢ্য স্থানে বিকাল 4 টায় শুরু হয়েছিল। ডাঃ আলিয়া, বাজমে আদব সোসাইটির সভাপতি, উর্দু বিভাগ, জাকির হোসেন দিল্লি কলেজ (সন্ধ্যা)।

জনাব শাকিল আহমেদ, গজল জগতের একজন উস্তাদ, তার আত্মা-আলোড়নকারী পরিবেশনা, শৈল্পিক উজ্জ্বলতা এবং ঘরানার গভীর উপলব্ধি প্রদর্শন করে শ্রোতাদের বিমোহিত করেছিলেন। কলেজ অডিটোরিয়াম গজলের সুমধুর সুরে প্রতিধ্বনিত হয়েছিল, শিক্ষার্থী, শিক্ষক এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের গজল উৎসাহীরা সহ বিভিন্ন পটভূমি থেকে উৎসাহী শ্রোতাদের আকর্ষণ করেছিল। মাহফিল-ই-গজল শুধুমাত্র একটি শৈল্পিক দর্শন হিসেবেই কাজ করেনি বরং অংশগ্রহণকারীদের সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধিতেও অবদান রাখে, এমন একটি পরিবেশ গড়ে তোলে যা উর্দু সাহিত্যের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের প্রশংসা করে এবং উদযাপন করে। জনাব শাকিল আহমেদের অভিনয় নিরবচ্ছিন্ন কমনীয়তায় অনুরণিত হয়েছিল, এমন একটি পরিবেশ তৈরি করেছিল যেখানে ভাষা ও সুরের সৌন্দর্য একত্রিত হয়ে একটি স্মরণীয় সন্ধ্যা তৈরি করেছিল।

এই ইভেন্টটি বাজমে-ই-আদব সোসাইটি, IQAC, এবং Viksit Bharat @2047-এর সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তির জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম প্রদান এবং শিল্পকলার জন্য একটি প্রশংসা বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতির উদাহরণ। জনাব শাকিল আহমেদের মাহফিল-ই-গজলটি একটি দুর্দান্ত সাফল্য ছিল, যা কলেজ সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক টেপেস্ট্রিতে একটি অমোঘ চিহ্ন রেখে যায়।

প্রফেসর মাজহার আহমদ, প্রফেসর মো. নওশাদ আলম, প্রফেসর জহির আলি খান, প্রফেসর শাহিনা তাবাসসুম, ডক্টর পঙ্কজ কান্ত রাজন, ডক্টর মোহাম্মদ ইউসুফ, ডক্টর মুজাফফরুল হাসান এবং ডক্টর সন্তোষ কুমার উপরে উল্লিখিত চারটি ইভেন্টের সাফল্য ও প্রাণবন্ততায় অবদান রেখেছিলেন। তাদের সম্পৃক্ততা সাংস্কৃতিক এবং

একাডেমিক উদ্যোগকে উৎসাহিত করার এবং সমগ্র সম্প্রদায়ের জন্য একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং সহায়ক পরিবেশ তৈরি করার দৃঢ় প্রতিশ্রুতি প্রতিফলিত করে।

পঞ্চতত্ত্ব: ইকো-ক্লাব এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজ সোসাইটি রিপোর্ট

পঞ্চতত্ত্ব: ইকো-ক্লাব দ্য এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজ সোসাইটি অফ জাকির হোসেন দিল্লি কলেজ (সান্ধ্য) হল একটি কলেজ ভিত্তিক ক্লাব যা শিক্ষক এবং ছাত্রদের দ্বারা পরিচালিত হয় যার লক্ষ্য হল পরিবেশগত সমস্যাগুলির গুরুত্ব এবং টেকসই উন্নয়নের বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে মানুষকে আলোকিত করা। সারা বছর ধরে এই সোসাইটি পরিবেশের প্রতি অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানোর জন্য আকর্ষণীয় সেশন, ভ্রমণ, প্রতিযোগিতা এবং সেমিনার আয়োজন করে থাকে। এই সোসাইটির কাজ হচ্ছে পরিবেশের বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য উদযাপন করা এবং এর বিষয়গুলো সম্পর্কে সবাইকে আরও বেশি অনুসন্ধানী ও সচেতন করে তোলা।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস, ৫ই জুন, ২০২৩

বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপনের মধ্য দিয়ে এনভায়রনমেন্টাল স্টাডি সোসাইটি "পঞ্চতত্ব" এর যাত্রা শুরু হয়।

যার জন্য একটি অনলাইন ইভেন্ট ECOLUTION আয়োজন করা হয়েছিল। ইভেন্টটি বিতর্ক এবং কুইজে বিপুল সংখ্যক উৎসাহী অংশগ্রহণ করে। এছাড়াও দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজ বিভাগের বন্দনা মিশ্র আমাদের থিম- 'টেকসই ফ্যাশন' - মিশন-লাইফের অধীনে পরিবেশগত পদচিহ্ন হ্রাস করার বিষয়ে আলোকিত করেছেন।

Musculoskeletal এবং Ergonomics সেমিনার

"এইমস নয়া দিল্লি এবং ইন্দ্রপ্রস্থ শক্তি"-এর সহযোগিতায় সোসাইটি কোভিড-পরবর্তী 'মাস্কুলোস্কেলিটাল প্রবলেমস অ্যান্ড ergonomics'-এর উপর ভিত্তি করে সেমিনারের আয়োজন করেছিল। সেমিনারটি ছিল একটি গেম চেঞ্জার। আমাদের স্পিকার, ডঃ উমা কুমার এর মেরুদণ্ড এবং ergonomic সম্পর্কে অমূল্য অন্তর্দৃষ্টি সেমিনারকে সফল করে তোলে।

NSS এর সাথে পরিচ্ছন্নতা অভিযান, 1লা অক্টোবর, 2023

পঞ্চতত্ত্ব: ইকো ক্লাব এবং এনএসএস এমএসডির সাথে একত্রে এসপি জোন (দিল্লি) কাশ্মীরি গেটে একটি পরিচ্ছন্নতা অভিযানের আয়োজন করেছিল, যেখানে সদস্যরা এলাকা থেকে বিপুল পরিমাণ প্লাস্টিক বর্জ্য সংগ্রহ করেছিল। ‘স্বচ্ছতা অভিযান’ -এর উদ্যোগে ‘গান্ধী জয়ন্তী’ উপলক্ষে অনুষ্ঠানটির পরিকল্পনা ও আয়োজন করা হয়। পরিচ্ছন্নতা অভিযানের এই সফল ইভেন্টের জন্য স্টাফ সদস্যরা এবং শিক্ষার্থীরা সমন্বিতভাবে এবং সম্মিলিতভাবে তাদের মনোভাব দেখিয়েছিল।

ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম (10 OCTOBER, 2023): নতুন সদস্য, ছাত্র বা উৎসাহীদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং মূল দলের সদস্যদের নির্দেশনায় একটি ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম পরিচালিত হয়েছিল। শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের পরিচিতির মাধ্যমে ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম শুরু হয়।

দীপাবলি মেলা 6 নভেম্বর, 2023

সোসাইটি পরিবেশ বান্ধব দীপাবলি উদযাপনের উদ্যোগ নেয় যার মধ্যে অনেক মজার জিনিস রয়েছে যা পরিবেশ বান্ধব ছিল। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন খাবারের স্টল এবং সৃজনশীল জিনিসপত্র প্রদর্শন করা হয়। নাচ ও গানের পরিবেশনা, নুক্কাড় নাটক ছিল অনুষ্ঠানের দর্শকপ্রিয়তা।

এছাড়াও বিভিন্ন প্রতিযোগিতা ছিল যেমন পট পেইন্টিং, রঙ্গোলি তৈরি ইত্যাদি। পাশাপাশি ছিল ট্রেজার হান্ট এবং র‍্যাম্প ওয়াক। পরিবেশবান্ধব দীপাবলি উদযাপনের কথা মাথায় রেখেই সবকিছু করা হয়েছিল।

মাটির গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে এবং মাটি ব্যবস্থাপনার ক্ষমতার পক্ষে কথা বলার জন্য প্রতি বছর 5 ডিসেম্বর বিশ্ব মৃত্তিকা দিবস পালন করা হয়।

যমুনা পরিচ্ছন্নতা ও প্ল্যান্টেশন ড্রাইভ প্রকল্পের সূচনা

ইকো ক্লাবের সদস্যরা ৩০ কেজি প্লাস্টিক বর্জ্য তোলার চমৎকার উদ্যোগ নেয়। যেখানে কয়েক দলের সদস্যরা পরিদর্শন করেছেন এবং মার্চ মাস পর্যন্ত সপ্তাহে একবার যমুনা ঘাট পরিদর্শন করেন।

"পরিচ্ছন্ন যমুনা মিশন," একটি দুই বছরব্যাপী প্রকল্প, ইকোক্লাবের সমন্বয়ক এবং প্রকল্পের আহ্বায়ক ডঃ স্মিতা সুন্দরম, সমস্ত পদাধিকারী এবং ইকোক্লাব ছাত্রদের সাথে চালু করেছিলেন। মোট 60 জন ছাত্র নিয়মিত ইভেন্টে অংশগ্রহণ করে। মাসে দুবার পরিচ্ছন্নতা অভিযানের আয়োজন করা হয় এবং ছাত্ররা যমুনাকে পরিষ্কার রাখার জন্য বেশ কিছু সচেতনতামূলক অভিযান পরিচালনা করে।

29শে জানুয়ারী 2024-এ, বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে সোসাইটি একটি আন্তঃকলেজ "বিতর্ক এবং তথ্যচিত্র প্রতিযোগিতা" পরিচালনা করেছিল যেখানে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন কলেজের শিক্ষার্থীরা তাদের মতামত এবং ধারণা নিয়ে এসেছিল এবং একটি বিতর্ক হয়েছিল যার জন্য বিজয়ীদেরও পুরস্কৃত করা হয়েছিল।

12 ফেব্রুয়ারী 2024-এ সরকারী সুন্দর নার্সারি ম্যানেজমেন্ট ট্রাস্টের সহযোগিতায় এবং সহায়তায় সোসাইটি পরিবেশগত অধ্যয়ন সমিতির শিক্ষার্থীদের জন্য স্বাক্ষরিত 'মৌমাছি জানুন' কর্মশালার আয়োজন করে।

সুন্দর নার্সারির স্বাস্থ্যকর পরিবেশে পরিচালিত এই ইন্টারেক্টিভ এবং অর্থপূর্ণ কর্মশালার মাধ্যমে সদস্যরা ক্ষুদ্র পরাগায়নকারীদের সম্পর্কে কাঙ্ক্ষিত সহানুভূতি এবং সচেতনতা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিল।

সরমায়া - কমার্স সোসাইটি রিপোর্ট

ভূমিকাঃ

সারমায়া সোসাইটি এই শিক্ষাবর্ষ জুড়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজন করে। এই ইভেন্টগুলির লক্ষ্য শিক্ষার্থীদের মূল্যবান জ্ঞান, নির্দেশিকা এবং ক্যারিয়ারের পথ, দক্ষতা বিকাশ এবং বর্তমান বিষয়গুলির অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করা।

1. ওয়েবিনার: "স্নাতকের পরে ক্যারিয়ার"

তারিখ: আগস্ট 31, 2023

অতিথি বক্তা: জনাব জাহিদ হুসেন (MBA, B.Tech, CCCP, ITIL V3.0 সার্টিফাইড)

হাইলাইট:

· স্নাতকের পরে বিভিন্ন কর্মজীবনের পথ অন্বেষণ করা হয়েছে, ঐতিহ্যগত ভূমিকার বাইরে বিকল্পগুলি প্রদর্শন করা হয়েছে।

· জনাব হোসেনের গতিশীল উপস্থাপনা শৈলী শেখার উত্তেজনাপূর্ণ এবং কৌতূহল উদ্দীপিত করে তোলে।

· স্নাতক-পরবর্তী কোর্স এবং তাদের সম্ভাব্য কর্মজীবনের প্রভাব সম্পর্কে গভীর জ্ঞান প্রদান করা।

2. শিক্ষক দিবস উদযাপন

তারিখ: সেপ্টেম্বর 5, 2023

বর্ণনা:

এই অনুষ্ঠানে শিক্ষকদের অমূল্য অবদান উদযাপন করা হয়। শিক্ষার্থীরা হস্তনির্মিত কার্ড, সঙ্গীত পরিবেশনা এবং ইন্টারেক্টিভ গেমের মাধ্যমে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

3. জিএল বাজাজ ইনস্টিটিউট সেমিনার: "আন্তর্জাতিক সম্মেলন ব্যবস্থাপনা শিক্ষা 5.0"

তারিখ: সেপ্টেম্বর 10-11, 2023

হাইলাইট:

· শিক্ষা ও প্রযুক্তির উদীয়মান প্রবণতা নিয়ে আলোচনা করার জন্য শিল্প বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাবিদ এবং ছাত্রদের একত্রিত করা হয়েছে।

· ধারণা এবং অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য ইন্টারেক্টিভ সেশন অনুমোদিত।

· কর্মশালা বাস্তব-বিশ্বের পরিস্থিতিতে প্রযোজ্য বাস্তব জ্ঞান এবং দক্ষতা প্রদান করে।

· কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উপর প্রফেসর জমচিদ আসাদির মূল বক্তব্য চিন্তা-উদ্দীপক আলোচনার জন্ম দিয়েছে।

4. সেমিনার: "কীভাবে জিডি/পিআই ক্র্যাক করবেন"

তারিখ: সেপ্টেম্বর 12, 2023

অতিথি বক্তা: ডঃ মনিকা আগরওয়াল (পর্যটন ব্যবস্থাপনায় পিএইচডি, নেট যোগ্য)

হাইলাইট:

· ডঃ আগরওয়ালের ইন্টারেক্টিভ পদ্ধতি একটি গতিশীল শিক্ষার পরিবেশ গড়ে তুলেছে।

· গ্রুপ আলোচনা (GDs) এবং ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে (PIs) শ্রেষ্ঠত্বের জন্য মূল্যবান কৌশল এবং কৌশল প্রদান করা হয়েছে।

· ছাত্রদের তাদের দক্ষতা বাড়াতে এবং আত্মবিশ্বাস তৈরি করতে সাহায্য করার জন্য ব্যক্তিগতকৃত পরামর্শ এবং গঠনমূলক প্রতিক্রিয়া দেওয়া।

· ভ্রমণ ব্যবস্থাপনা এবং গ্রাহক সম্পর্ক ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা সেমিনারে গভীরতা যোগ করেছে।

5. সেমিনার: "ব্যবস্থাপনায় ক্যারিয়ার"

তারিখ: সেপ্টেম্বর 19, 2023

অতিথি বক্তা: শ্রী নবনীত আনন্দ (এমবিএ, বি.টেক)

হাইলাইট:

· জনাব আনন্দের উপস্থাপনা ব্যবস্থাপনায় পোস্ট-গ্রাজুয়েশন ক্যারিয়ার পছন্দ নেভিগেট করার জন্য একটি রোডম্যাপ প্রদান করেছে।

· তিনি ম্যানেজমেন্ট ক্যারিয়ারের বহুমুখী জগতে গভীর ডুব দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছেন।

· যোগ্যতার কাজগুলি শিক্ষার্থীদের সমস্যা সমাধানের দক্ষতা এবং সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা প্রয়োগ করতে চ্যালেঞ্জ করেছিল।

· এমবিএ কলেজ, অফার এবং সম্ভাব্য সুবিধাগুলির ব্যাপক অনুসন্ধান।

· প্রশ্নোত্তর অধিবেশন অংশগ্রহণকারীদের কর্মজীবন পরিকল্পনা এবং একটি MBA অনুসরণ সম্পর্কে স্পষ্টীকরণ চাইতে অনুমতি দেয়.

6. আয়ারল্যান্ড সফরে শিক্ষা

তারিখ: 30 সেপ্টেম্বর, 2023

হাইলাইট:

· আইরিশ বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ভর্তি প্রক্রিয়ার জটিলতাগুলি সরল করার বিষয়ে তথ্য প্রদান করা হয়েছে।

· শিক্ষার্থীরা আটলান্টিক টেকনোলজিক্যাল ইউনিভার্সিটি এবং ডাবলিন বিজনেস স্কুলের মতো মর্যাদাপূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিদের সাথে যোগাযোগ করেছে।

· স্কলারশিপ সুযোগ, ভিসা আবেদন প্রক্রিয়া, এবং সাংস্কৃতিক একীকরণ অন্বেষণ করা হয়েছে।

· পাঠ্যক্রম কাঠামো, শিল্প অংশীদারিত্ব, এবং কর্মজীবনের সম্ভাবনা সহ ফিনান্সে এমবিএ করার বিষয়ে গভীর আলোচনা।

7. CAT কর্মশালা: "ACE CAT 2024"

তারিখ: সেপ্টেম্বর 24, 2023

আয়োজন করেছে: ক্যারিয়ার লঞ্চার

অতিথি বক্তা: শ্রী শুভম কুমার সিং (বিএসসি (অনার্স) পদার্থবিদ্যায়)

হাইলাইট:

· মিঃ সিং পরিমাণগত যোগ্যতার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে একটি সেশন পরিচালনা করেন, উজ্জ্বলতার সাথে সমস্যাগুলি সমাধান করেন।

· ইভেন্টটি সন্দেহ দূরীকরণ, কৌশলগত প্রস্তুতি এবং বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে মূল্যবান টিপস পেতে একটি প্ল্যাটফর্ম প্রদান করেছে।

· ইন্টারেক্টিভ এবং ব্যক্তিগতকৃত পদ্ধতির বিষয়বস্তু একাডেমিক পাঠ্যক্রমের সাথে সংযুক্ত।

8. ফ্রেশার ডে সেলিব্রেশন: "ফ্রেস্কো ফিয়েস্তা 2k23"

তারিখ: 6 অক্টোবর, 2023

হাইলাইট:

· আগত শিক্ষার্থীদের স্বাগত জানাই এবং সম্প্রদায়ের বোধ জাগিয়ে তোলে।

· প্রোগ্রাম অন্তর্ভুক্ত:

o উদ্বোধনী বক্তৃতা অধ্যাপক ড. মাসরুর আহমেদ বেগ (অধ্যক্ষ) এবং মিসেস গরিমা (সারমায়া সভাপতি)

o সঙ্গীত এবং নৃত্য পরিবেশনা

o ইন্টারেক্টিভ "ইমোজি চ্যালেঞ্জ" গেম

o মিস্টার অ্যান্ড মিসেস ফ্রেশার প্রতিযোগিতা

o পুরস্কার বিতরণ এবং ব্রেইনটিজার

o বোনাস গেম: "সেলিব্রিটির নাম দিন!"

· মিস্টার অ্যান্ড মিসেস ফ্রেশার বিজয়ীদের ঘোষণা এবং সমাপনী বক্তৃতার মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি সমাপ্ত হয়।

9. "এনজেন্ডারিং কোটা: উইমেনস রিজার্ভেশন অ্যাক্ট, 2023" বিষয়ক কর্মশালা (12 অক্টোবর, 2023)

o ডঃ আম্বেদকর চেয়ার ইন সোশ্যাল জাস্টিস, আইআইপিএ দ্বারা সংগঠিত

o মহিলা সংরক্ষণ আইন 2023 এর প্রভাব এবং বাস্তবায়ন কৌশল নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে

o ফোকাস করা হয়েছে:

 আইনের বিধান এবং উদ্দেশ্যগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ

 আইনি বিশ্লেষণ এবং সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ

 কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য লিঙ্গ মূলধারার কৌশল

 সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ

 স্টেকহোল্ডার জড়িত এবং সহযোগিতা

10. MBA কর্মশালা (23 জানুয়ারী, 2024)

o ওয়াইএমসিএ, কনট রোড, নয়াদিল্লিতে একটি শিক্ষা মেলায় অনুষ্ঠিত

o এমবিএ এবং পিজিডিএম প্রোগ্রামে বিভিন্ন সুযোগ তুলে ধরে

o ব্যবসায় প্রশাসনে বিশেষীকরণ এবং কর্মজীবনের পথের অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে

o প্রতিষ্ঠান, পেশাদার এবং সহকর্মীদের সাথে মিথস্ক্রিয়া এবং নেটওয়ার্কিংয়ের গুরুত্বের উপর জোর দেওয়া হয়েছে

11. সেমিনার: "VIKSIT BHARAT@2047" (24 জানুয়ারী, 2024)

o অতিথি বক্তা: ডঃ প্রবেশ কুমার চৌধুরী, সহকারী অধ্যাপক, সিসিপিপিটি, জেএনইউ

o অন্বেষণ ড. বি.আর. 2047 সালের মধ্যে একটি উন্নত ভারতের জন্য আম্বেদকরের দৃষ্টিভঙ্গি

o কৃষি, নারীর অধিকার এবং নতুন শিক্ষানীতির মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলো নিয়ে আলোচনা করেছেন

o ভিক্সিত ভারত মিশনের নেতৃত্বে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ভূমিকা তুলে ধরেন

12. সেমিনার: "পরিবর্তনশীল ব্যবসায়িক ল্যান্ডস্কেপে প্রয়োজনীয় দক্ষতায় গভীরভাবে ডুব দেওয়া" (ফেব্রুয়ারি 9, 2024)

o IQAC-এর সহযোগিতায় সাময়া আয়োজিত

o অতিথি বক্তা: ডাঃ স্বপ্না রাকেশ, পরিচালক, জিএল বাজাজ ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিসার্চ

o সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা, সমস্যা সমাধান, অভিযোজনযোগ্যতা এবং ডিজিটাল সাক্ষরতার দক্ষতার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছেন

o কর্মজীবনের সাফল্যের জন্য ক্রমাগত শেখার এবং দক্ষতা বিকাশের গুরুত্বকে আন্ডারলাইন করেছেন

13. সেমিনার: "মার্কেটিংয়ে ক্যারিয়ারের সুযোগ" (ফেব্রুয়ারি 12, 2024)

ক অতিথি বক্তা: শ্রী তথাগত জৈন, ফার্মলে-এর সিনিয়র মার্কেটিং ম্যানেজার

খ. বিপণনে ভবিষ্যত ক্যারিয়ার নেভিগেট করার নির্দেশিকা প্রদান করেছে

গ. বিপণন ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্বের জন্য ব্যবহারিক কৌশল এবং কৌশল প্রস্তাব করা হয়েছে

d বিভিন্ন কোম্পানির মূল বিপণন কৌশল নিয়ে আলোচনা করেছেন

সংস্কৃত ডিপার্টমেন্টাল সোসাইটি রিপোর্ট

সংক্ষিপ্ত তথ্য: 2023-24 শিক্ষাবর্ষের শুরুতে সংস্কৃত বিভাগ ZHDCE আমাদের শিক্ষার্থীদের সংস্কৃতের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করতে 31শে আগস্ট 2023 তারিখে সংস্কৃত দিবস উদযাপনের আয়োজন করেছে।

2023 সালের অক্টোবর মাসে (16-28 অক্টোবর 23) আমাদের বিভাগ আমাদের কলেজে 10 দিনের কথ্য সংস্কৃত শিবিরের (সংস্কৃত সম্ভাষণ শিবির) আয়োজন করে যেখানে শিক্ষার্থীরা সংস্কৃত বলার প্রশিক্ষণ পায়।

29শে জানুয়ারী 2024 থেকে 3রা ফেব্রুয়ারী 2024 পর্যন্ত আমাদের বিভাগ 'আয়ুর্বেদ এবং এর বিভিন্ন মাত্রা' নিয়ে এক সপ্তাহব্যাপী কর্মশালার আয়োজন করে যেখানে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বা কলেজের বিশিষ্ট পণ্ডিতরা এবং গবেষণা পণ্ডিতরা পেপার উপস্থাপন করেন এবং মতামত শেয়ার করেন এবং উল্লিখিত বিষয়ে আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি করেন।

আহ্বায়ক - ডঃ সমীর কুমার মিশ্র

গণিত সোসাইটি সিফরের বার্ষিক প্রতিবেদন

গণিত সোসাইটি-সিফর, IQAC-এর সহযোগিতায় এবং Viksit Bharat @2047-এর ব্যানারে, "অগ্রগতির পাটিগণিত" বিষয়ে তার বার্ষিক বক্তৃতার আয়োজন করেছে। ইভেন্টটি 23 ফেব্রুয়ারী, 2024-এ অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

অনুষ্ঠানের বিবরণ:

- বিষয়: অগ্রগতির পাটিগণিত

- রিসোর্স পার্সন: ড. আখলাক হোসেন, আইআইটিকে থেকে পিএইচডি, সহযোগী অধ্যাপক, গণিত বিভাগ, জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া, নতুন দিল্লি

- পরিচালনা করেছেন: ড. মোহাম্মদ আসিফ, গণিত সোসাইটি-সিএফইআর-এর সভাপতি এবং গণিত বিভাগের শিক্ষক-ইন-চার্জ, Z.H.D.C.E., D.U.

- তারিখ এবং সময়: 23 ফেব্রুয়ারি, 2024, বিকাল 5 টায়

- ভেন্যু: A.V. রুম, সায়েন্স ব্লক

প্রোগ্রাম হাইলাইট:

- ডঃ আখলাক হোসেন একটি পাওয়ারপয়েন্ট প্রেজেন্টেশন ব্যবহার করে তার বক্তৃতা প্রদান করেন, যা অগ্রগতির পাটিগণিত সম্পর্কে মূল্যবান অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে।

- অনুষ্ঠানটি সম্মানিত ফ্যাকাল্টি সদস্য এবং উৎসাহী ছাত্রদের উপস্থিতি দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল।

সারাংশ: বক্তৃতা দুটি ভাগে বিভক্ত। প্রথম অংশে, রিসোর্স পার্সন সেমিপ্রাইম এবং স্ফেনিক সংখ্যা নিয়ে আলোচনা করে যা বর্তমানে এবং ভবিষ্যতের প্রয়োজনীয়তার জন্য ব্যবহৃত অনেক পাবলিক কী ক্রিপ্টোসিস্টেমের নকশা তৈরি করে। একটি সেমিপ্রাইম হল একটি যৌগিক সংখ্যা যা দুটি মৌলিক সংখ্যার গুণফল হিসাবে লেখা যেতে পারে (সম্ভবত সমান) এবং একটি যৌগিক সংখ্যাকে স্ফেনিক বলা হয় যদি এটি তিনটি স্বতন্ত্র মৌলিক সংখ্যার গুণফল হয়। ডঃ হোসেন সেমিপ্রাইম এবং স্ফেনিক সংখ্যা গণনা করার জন্য বিশ্লেষণাত্মক সূত্র আলোচনা করেন। সেমিপ্রাইম এবং স্ফেনিক সংখ্যার গণনা এই সূত্রগুলি এবং k-প্রায় প্রাইমগুলির জন্য সুপরিচিত অ্যাসিম্পোটিক ডিস্ট্রিবিউশনগুলি ব্যবহার করে সংখ্যাগতভাবে যাচাই করা হয়। প্রাকৃতিক সংখ্যার মধ্যে সেমিপ্রাইম এবং স্ফেনিক সংখ্যার বিতরণ উলাম স্পাইরাল এবং পোলার স্পাইরালগুলির মাধ্যমে প্রদান করা হয় যা পাইথন কোড ব্যবহার করে প্রাপ্ত হয়। প্রাইমগুলির জন্য সুপরিচিত উলাম সর্পিলগুলির অনুরূপ এই সর্পিলগুলিতে বেশ কয়েকটি আকর্ষণীয় নিদর্শন দৃশ্যমান। স্ফেনিক সংখ্যার প্রাসঙ্গিকতা এবং গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে ডেটা, ইন্টারনেট, যোগাযোগ ইত্যাদির নিরাপত্তার জন্য, পাবলিক কী ক্রিপ্টোসিস্টেমগুলিকে এনক্রিপ্ট করার, ডিক্রিপ্ট করার জন্য এবং গোপন বার্তাগুলিকে ডিজিটালভাবে স্বাক্ষর করার জন্য ডিজাইন করার মাধ্যমে স্ফেনিক সংখ্যার ক্যানোনিকাল পচনকে তিনটি স্বতন্ত্র প্রাইমের পণ্যে ব্যবহার করে।

দ্বিতীয় অংশে, স্পিকার ফ্র্যাক্টালগুলির একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এবং ইউক্লিডীয় সমতলে পূর্ণসংখ্যা ম্যাট্রিক্স এবং স্ট্যান্ডার্ড প্রতিফলন/ঘূর্ণনের মাধ্যমে প্রাপ্ত টাইলিংগুলির উপর বিশেষ ফোকাস সহ ফ্র্যাক্টাল টাইলিংগুলির একটি দ্রুত জরিপ প্রদান করে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই টাইলিংগুলির প্রয়োগগুলি নির্দেশ করা হয়েছে।

এনএসএস ইউনিটের বার্ষিক প্রতিবেদন

আমাদের কলেজের এনএসএস ইউনিট 2023-24 শিক্ষাবর্ষে বেশ কয়েকটি ইভেন্টের আয়োজন করেছে যার বিশদ বিবরণ নিম্নরূপ:

জাকির হোসেন দিল্লি কলেজের NSS ইউনিট (ইভেনিং) G20 এবং আজাদি কা অমৃত মহোৎসবের তত্ত্বাবধানে 2 এবং 3 মে 2023-এ YUVAAN-2023 (যুবদের একটি উৎসব) আয়োজন করেছে। এটি উদ্বোধন করেন

আমাদের অধ্যক্ষ প্রফেসর (ড.) মাসরুর আহমদ বেগ। ইভেন্টের প্রথম দিনে, এলএনজেপি হাসপাতালের ডাঃ রিতু সাক্সেনা 'দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার সমস্যা' এবং মিসেস নলিনী কামাল 'মেডিটেশনের উপকারিতা' বিষয়ে বক্তৃতা দেন। এরপর ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। দ্বিতীয় দিনে, মিস অঙ্কিতা মিশ্র, আইএএস, ডিসি, সিটি এসপি জোন, এমসিডি, 'একক-ব্যবহারের প্লাস্টিক হ্রাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের ভূমিকা' বিষয়ে বক্তৃতা দেন। এর পরে ছিল লোক/শাস্ত্রীয়/সেমিক্লাসিক্যাল নৃত্য প্রতিযোগিতা, শাস্ত্রীয়/সেমিক্লাসিক্যাল সঙ্গীত প্রতিযোগিতা এবং যোগ প্রতিযোগিতা (গ্রুপ)।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় দিনে এনএসএস ই-ম্যাগাজিন UDGAM-এর উদ্বোধনী সংস্করণ প্রকাশ করা হয়। জাকির হোসেন দিল্লি কলেজের এনএসএস ইউনিট (ইভিনিং) 20 এপ্রিল 2023-এ G20-এর অধীনে একটি আন্ত-কলেজ বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিল।

জাকির হোসেন দিল্লি কলেজের NSS ইউনিট (সান্ধ্যকালীন) ভারত সরকারের আয়ুষ মন্ত্রকের MDNIY-এর একজন যোগ প্রশিক্ষকের সহায়তায় আজ আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদযাপন করেছে। জাকির হোসেন দিল্লি কলেজের এনএসএস ইউনিট (সান্ধ্যকালীন) 19 এবং 20 জুন 2023 তারিখে বাসুধৈব কুটুম্বকমের উপর 2 দিনের যোগ কর্মশালার আয়োজন করেছে।

জাকির হোসেন দিল্লি কলেজের NSS ইউনিট (ইভেনিং), সাইবার PS সেন্ট্রাল ডিস্ট্রিক্ট, দিল্লির সহযোগিতায়, 5 জুলাই 2023-এ সাইবার জাগ্রত দিবস উদযাপন করেছে। জাকির হোসেন দিল্লি কলেজের NSS ইউনিট (ইভেনিং) 3 জুলাই 2023-এ একটি পরিচ্ছন্নতা অভিযানের আয়োজন করেছে কলেজ ক্যাম্পাসে।

জাকির হোসেন দিল্লী কলেজের NSS ইউনিট (ইভিনিং) দ্বারা IQAC এর সহযোগিতায় 11ই আগস্ট 2023 তারিখে কলেজ ক্যাম্পাসে অধ্যক্ষ, প্রোগ্রাম অফিসার, ফ্যাকাল্টি মেম্বার এবং NSS এর উপস্থিতিতে পঞ্চ প্রাণ অঙ্গীকার অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। স্বেচ্ছাসেবক।

জাকির হোসেন দিল্লী কলেজের এনএসএস ইউনিট (ইভিনিং) এনএসএস দিবস উদযাপন করেছে যাতে প্রোগ্রাম অফিসার, ফ্যাকাল্টি মেম্বার এবং প্রচুর সংখ্যক এনএসএস স্বেচ্ছাসেবক উপস্থিত ছিলেন।

জাকির হোসেন দিল্লি কলেজের এনএসএস ইউনিট এবং ইকো-ক্লাব (ইভেনিং) 1 অক্টোবর 2023 তারিখে সকাল 10 টা থেকে 11 টা পর্যন্ত এমসিডি সিটি এসপি জোনের সহযোগিতায় কাশ্মীরি গেট মেট্রো স্টেশনের সামনে একটি পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করে (এক তারীখ, এক ঘণ্টা কর্মসূচি)।

19 অক্টোবর 2023 তারিখে SVEEP-এর তত্ত্বাবধানে নির্বাচনী ব্যবস্থা এবং ভোটারদের সচেতনতার উপর একটি আন্ত-কলেজ কুইজ প্রতিযোগিতা এবং এক্সটেম্পোর বক্তৃতা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল।

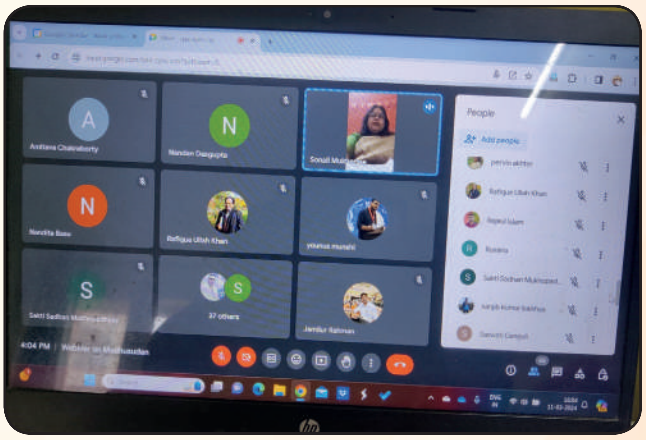
4:04 PM | Webinar on Madhusudan

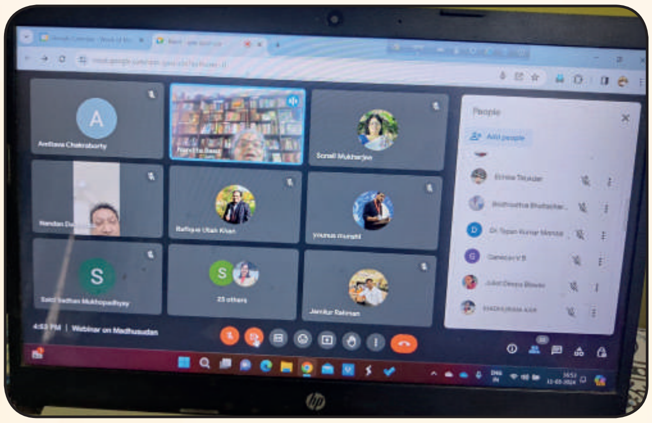
4:53 PM | Webinar on Madhusudan

3:11 PM | Webinar on Madhusudan

GPS Map Camera
Delhi, Delhi, India
LIBRARY, ZAKIR HUSAIN DELHI COLLEGE, Jawaharlal Nehru Marg, SKD Basti, Press Enclave, Savitri Nagar, Delhi, 110002, India
Lat 28.640292°
Long 77.230061°
29/02/24 05:40 PM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Delhi, Delhi, India
LIBRARY, ZAKIR HUSAIN DELHI COLLEGE, Jawaharlal Nehru Marg, SKD Basti, Press Enclave, Savitri Nagar, Delhi, 110002, India
Lat 28.640275°
Long 77.230187°
29/02/24 06:01 PM GMT +05:30

GPS Map Camera
Delhi, Delhi, India
LIBRARY, ZAKIR HUSAIN DELHI COLLEGE, Jawaharlal Nehru Marg, SKD Basti, Press Enclave, Savitri Nagar, Delhi, 110002, India
Lat 28.640292°
Long 77.230061°
29/02/24 05:40 PM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Delhi, Delhi, India
LIBRARY, ZAKIR HUSAIN DELHI COLLEGE, Jawaharlal Nehru Marg, SKD Basti, Press Enclave, Savitri Nagar, Delhi, 110002, India
Lat 28.640277°
Long 77.230222°
29/02/24 06:02 PM GMT +05:30
Google

ZAKIR HUSAIN DELHI COLLEGE (EVENING)

SUNDER NURSERY
Delhi's Heritage Park

Zakir Husain Delhi College (Evening)

CLAPBOX

BASANT '24
BASANT

"Viksit Bharat @2047"
ZAKIR HUSAIN DELHI COLLEGE (EVENING)
University of Delhi
Department of Urdu

GPS Map Camera
New Delhi, Delhi, India
ZAKIR HUSAIN DELHI COLLEGE, 6, Maharaja Ranjeet Singh Marg, SKD Basti, LNJP Colony, Savitri Nagar, New Delhi, Delhi, 110002, India
Lat 28.640041°
Long 77.230478°
23/11/23 08:10 PM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
New Delhi, Delhi, India
ZAKIR HUSAIN DELHI COLLEGE, 6, Maharaja Ranjeet Singh Marg, SKD Basti, LNJP Colony, Savitri Nagar, New Delhi, Delhi, 110002, India
Lat 28.640025°
Long 77.230484°
23/11/23 04:58 PM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
New Delhi,DL,India
Jawahar Lal Nehru Marg, Jawahar Lal Nehru Road Area, New Delhi, 110002, DL, India
Lat 28.639952, Long 77.230448
02/13/2024 05:22 PM GMT+05:30
Note : Captured by GPS Map Camera

GPS Map Camera
New Delhi,DL,India
Jawahar Lal Nehru Marg, Jawahar Lal Nehru Road Area, New Delhi, 110002, DL, India
Lat 28.640227, Long 77.230379
02/13/2024 05:29 PM GMT+05:30
Note : Captured by GPS Map Camera

GPS Map Camera
Delhi, Delhi, India
LIBRARY, ZAKIR HUSAIN DELHI COLLEGE, Jawaharlal Nehru Marg, SKD Basti, Press Enclave, Savitri Nagar, Delhi, 110002, India
Lat 28.640253°
Long 77.230022°
06/03/24 06:11 PM GMT +05:30
Google

WINNER

ZHDCE
ZHDCE

BEES AT SUNDER NURSERY
TO ENCOURAGE BEES AT SUNDER NURSERY, WE HAVE:

ZAKIR HUSAIN DELHI COLLEGE
DELHI UNIVERSITY

4th
ANNUAL CONVOCATION
Chief Guest:
Dr. Subhas Sarkar
Hon'ble Minister of State for Education
Guest of Honour: Prof.
Dean of Colleges
Zakir Husain
(Evening)
Date: 01.09.2023

"Viksit Bharat @2047"
ZAKIR HUSAIN DELHI COLLEGE (EVENING)
University of Delhi
Department of Urdu
in collaboration of
IQAC
organises a Lecture
the Light of Global

COSCO
GPS Map Camera
New Delhi,DL,India
Ranjit Singh Marg, Jawahar Lal Nehru Road Area, New Delhi, 110002, DL, India
Lat 28.639951, Long 77.230882
02/01/2024 15:35 GMT+05:30
Note : Captured by GPS Map Camera

JUST DO IT
INDIA
ZHDCE

University of Delhi
INDIA-SOUTH AFRICA @G20
CONVERGENCES AND CONCERNS
G20
PROF. MASROOR AHMAD BEG

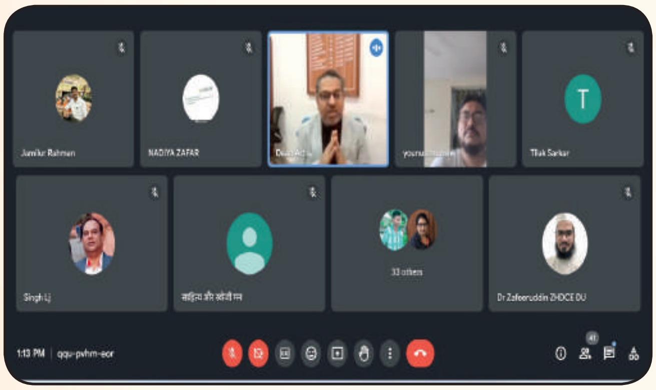
Jamilur Rahman
NADIYA ZAFAR
Singh Lj
साहित्य और संस्कृति मंच
33 others
Dr Zafeeruddin ZHDCE DU
1:13 PM | qqu-pvhm-eor

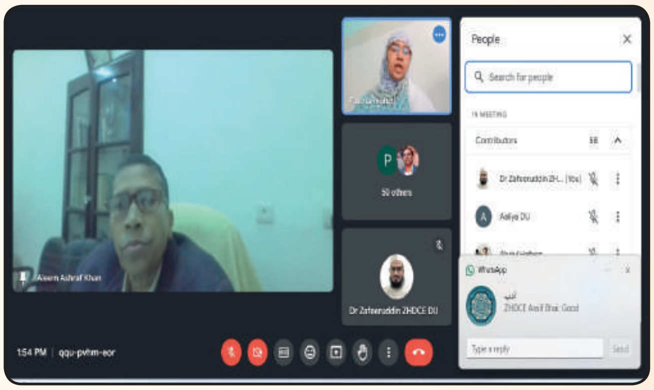
Aleem Ashraf Khan
50 others
Dr Zafeeruddin ZHDCE DU
People
Search for people
IN MEETING
Contributors 58
Dr Zafeeruddin ZH... (You)
Aaliya DU
WhatsApp
ZHDCE Asif Bhai: Good
Type a reply
Send
1:54 PM | qqu-pvhm-eor

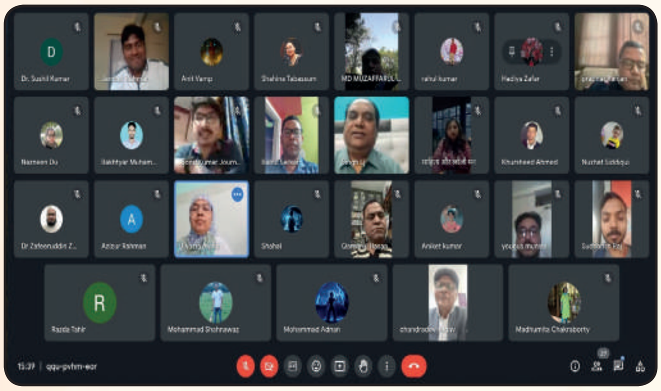
Dr. Sushil Kumar
Anil Vamp
Shahina Tabassum
MD MUZAFFARUL...
rahul kumar
Hadiya Zafar
Nazneen Du
Bakhtyar Muham...
Khursheed Ahmed
Nuzhat Siddiqui
Dr Zafeeruddin Z...
Azizur Rahman
Shohel
Aniket kumar
Razda Tahir
Mohammad Shahnawaz
Mohammed Adnan
Madhumita Chakraborty
15:39 | qqu-pvhm-eor

ZAKIR HUSAIN DELHI COLLEGE (EVENING)
PANCHTATVA: ECO CLUB
THE ENVIRONMENTAL STUDIES SOCIETY
BE ECODOPE

GPS Map Camera

New Delhi, DL, India

Jawahar Lal Nehru Marg, Jawahar Lal Nehru Road Area, New Delhi, 110002, DL, India

Lat 28.639994, Long 77.230415

08/25/2023 05:18 PM GMT+05:30

Note : Captured by GPS Map Camera

ZAKIR HUSAIN DELHI COLLEGE
Google
GPS Map Camera

New Delhi, Delhi, India

ZAKIR HUSAIN DELHI COLLEGE, 6, Maharaja Ranjeet Singh Marg, SKD Basti, LNJP Colony, Savitri Nagar, New Delhi, Delhi, 110002, India

Lat 28.639727°

Long 77.230103°

23/02/24 05:18 PM GMT +05:30

PANCHTATVA: ECO CLUB

ZAKIR HUSAIN DELHI COLLEGE (EVENING)
DELHI UNIVERSITY
PANCHTATVA: ECO CLUB
THE ENVIRONMENTAL STUDIES SOCIETY
ECOD

PRESENTS
PANCHTATVA
THE ANNUAL ECO FEST

বাংলা বিভাগের ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকগণ

ZAKIR HUSAIN DELHI COLLEGE
(UNIVERSITY OF DELHI)

ZAKIR HUSAIN DELHI COLLEGE
(UNIVERSITY OF DELHI)

ZAKIR HUSAIN COLLEGE
UNIVERSITY OF DELHI